পাণ্ডব গোয়েন্দা
কাঞ্চনজঙ্ঘায় ঝঞ্ঝাট

পাণ্ডব গোয়েন্দা

কাঞ্চনজঙ্ঘায় ঝঞ্ঝাট

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সপ্তদশ অভিযান

চৈত্রের শুরুতেই হঠাৎ গরমটা পড়ে গেল।

এই গরমে বাবলু তাই খুব ভোর ভোর উঠে তার পড়াশুনার পাঠ শেষ করে নিচ্ছে। সেদিনও পড়াশুনা শেষ করে চা জল খেয়ে ও একাই পঞ্চকে সঙ্গে নিয়ে চলল মিত্তিরদের বাগানে। একটি বেঁটে মোটা গুলঞ্চ গাছের তেফ্যাকড়া ডালের ওপর আধ শোয়া হয়ে মনের আনন্দে ওর নতুন কেনা মাউথ অগানটা বাজাতে লাগল। এই মনোরম নিরালা পরিবেশে ওর মাউথ অর্গানের সুর চারদিকের প্রকৃতিকে যেন নন্দিত করে তুলল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর আসবার সময় এখনও হয়নি। আরও অন্তত ঘণ্টাখানেক বাদে ওরা আসবে। এই সময়টুকু কাটাবে কী করে বাবলুর? তাই ওর মাউথ অগানের সুর সাধনা ওর এই দীর্ঘ একাকীত্বের সঙ্গী হল।

পঞ্চুও এই গরমে অযথা ছোটাছুটি না করে গাছতলাতেই শুয়ে রইল চুপচাপ। এমন সময় হঠাৎ একটা কান্নার সুর কানে এল বাবলুর। কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আরও গভীর জঙ্গলের ভেতর থেকে ভেসে আসছে কান্নার শব্দটা।

বাবলু অর্গান থামিয়ে কান খাড়া করে শুনল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল গাছ থেকে। বাবলুকে নামতে দেখে পঞ্চুও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাবলু চুপিসাড়ে জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে চলল। পঞ্চুও চলল পিছু পিছু সামান্য একটু যাওয়ার পরই কান্নার জায়গায় পৌছে গেল ওরা। বাবলু দেখল জঙ্গলের গভীরে একটু ফাঁকা জায়গায় ঘন ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে মাটিতে ঘাসের বুকে মুখ গুজে কে যেন ফুলে ফুলে কাঁদছে।

পঞ্চু এগিয়ে গিয়ে তার ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে শুঁকতেই লাফিয়ে উঠল লোকটি। বাবলু তাকে দেখেই চিনতে পারল। কাছেই একটি গ্লাস ফ্যাক্টরিতে দারোয়ানের কাজ করে। বেঁটেখাটো শক্ত চেহারা। সম্ভবত নেপালি।

বাবলু বিস্মিত হয়ে বলল, "কী ব্যাপার, তুমি এখানে?"

লোকটি বলল, "খোকাবাবু তুম হিয়া?"

"আমি তো ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি। কিন্তু তুমি এইভাবে এখানে শুয়ে কাঁদছ কেন? কত দিনের পোড়ো বাগান। কত সাপখোপ আছে। এইভাবে এখানে এসে শোয়?

বাবলুর কথায় লোকটির শোক যেন উথলে উঠল। বলল, "আমার বড় দুঃখ খোকাবাবু! তাই মনের জ্বালা জুড়োতে এখানে এসে শুয়ে থাকি। যাতে কেউ আমাকে দেখতে না পায়। কেউ আমার কান্না শুনতে না পায়।"

বাবলু লোকটির পাশে ঘাসের ওপরই বসে পড়ল, "কী এমন দুঃখ তোমার, যাতে এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে কাঁদতে হয়?"

লোকটি বলল, "খোকাবাবু, গরিব লোকের দুঃখ তুমি কী বুঝবে? দশ দিন পহলে মুলুক থেকে চিঠি এসেছে আমার লেড়কির খুব অসুখ। কিন্তু খোকাবাবু, আমার কাছে এমন রুপিয়া নেই যে আমি মুলুক যাই। তার একটু দেখভাল করি। আমাদের ফ্যাক্টরিতে এখন ধর্মঘট চলছে। কবে মিটবে তা জানি না। অথচ আমার হাতেও কোনও টাকা-পয়সা নেই। চারদিকে আমার এত দেনা যে কারও কাছে হাত পাতলে একটি পয়সাও ধার পাব না। আমার লেড়কি হয়তো বিনা চিকিৎসায় শেষ হয়ে যাবে। আমি কী করব খোকাবাবু? আজ এক সাল লেড়কিকে আমি দেখিনি। তার জন্যে খুব মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার।"

লোকটির দুঃখের কথা শুনে বাবলুর বুকের ভেতরটা যেন হাহাকার করে উঠল। সত্যি! কত মানুষের কত দুঃখ। বাবলু ওর রুমালে করে লোকটির চোখের

জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, "এইভাবে ছোটছেলের মতো কাঁদে না। যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। তিনি নিশ্চয়ই তোমার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।"

লোকটি আবার ডুকরে কেঁদে বলল, "না না না। আমার কেউ নেই। আমার ভগবানও নেই।"

বাবলু বলল, "ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। কে বলল তোমার কেউ নেই? তোমার না লেড়কি আছে? আর ভগবানের ওপরও অভিমান করতে নেই। কী অসুখ হয়েছে তোমার লেড়কির?"

"মালুম নেহি! শুধু চিঠি এসেছে লেড়কির অসুখ। রুপিয়া নিয়ে মুলুক যেতে লিখেছে।"

"সে অনেক দূর বাবু।"

"নেপাল নিশ্চয়ই?"

"না না, নেপাল নয়। দার্জিলিং।"

"দার্জিলিং! তুমি তা হলে নেপালি নও? আমি তো তোমাকে নেপালি ভাবতাম।"

"আমি ভুটিয়া। আমার নাম রূপলাল ভুটিয়া। আমার লেড়কির নাম সোনারু। আমার একমাত্র লেড়কি। আমার প্রাণ। খুব ভালবাসে আমাকে। আমি যখন মুলুক থেকে কলকাতা চলে আসি তখন আমার গলা জড়িয়ে ধরে থাকে। আমাকে কিছুতেই আসতে দিতে চায় না। ওর কিছু হলে আমার বুক ফেটে যায় খোকাবাবু অথচ ওর অসুখ শুনেও ওর কাছে যাবার কোনও উপায়ই আমার নেই। আমি নিজেই পেটে খেতে পাই না। দেখবে খোকাবাবু, আমার লেড়কির ফটো দেখবে?" বলে বুক পকেট থেকে একটি পুরনো ময়লা ফটো বার করে বাবলুর হাতে দিল রূপলাল।

বাবলু ফটোটা হাতে নিয়ে দেখল। একটি ন-দশ বছরের ফুটফুটে বালিকার ফটো। কচি কচি ঢল ঢল সেই পর্বত দুহিতার নিষ্পাপ মুখখানি দেখলে সত্যই মায়া হয়।

বাবলু ফটোটা রূপালালকে দিয়ে বলল, "তুমি একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে এসো রূপলাল ভাই। আমি চেষ্টা করে দেখি তোমার জন্য কতদূর কী করতে পারি।"

রূপলাল বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "খোকাবাবু! এ তুমি কী বলছ খোকাবাবু! সত্যিই তুমি আমার জন্য কিছু করবে?"

"আমি তোমাকে আসতে বলছি এসো।"

ওরা ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখল সেই ভাঙা বাড়িটার সামনে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

বাবলু রূপলালকে নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

বিলু বলল, "ওই জঙ্গলের ভিতর কী করছিলি রে বাবলু?"

ভোম্বল বলল, "আমরা এসে তুই এখনও আসিসনি মনে করে চুপচাপ বসে আছি।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "শোন, আজ আমাদের খুব ভাল একটা কাজ করবার সুযোগ এসেছে।"

সবাই বলল, "কীরকম!"

"লোকটিকে চিনিস?"

"হ্যাঁ, গ্লাস ফ্যাক্টরির দারোয়ান।"

"ওর নাম রূপলাল। ওর মেয়ের খুব অসুখ। কিন্তু এমনই অবস্থা বেচারার যে শুধুমাত্র টাকা-পয়সার অভাবে মেয়ের অসুখ জেনেও দেশে যেতে পারছে না ও। তাই আমি চাইছি আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দাদের তরফ থেকে ওকে কিছু সাহায্য করতে।"

বিলু বলল, "উত্তম প্রস্তাব। বিশেষ করে এটি একটি সত্যিকারের সৎ কাজ।"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া তুই যখন মত করেছিস তখন আমরা সবাই তোর সঙ্গে একমত। ওর কত কী হলে হয় সেটা ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ।"

বাবলু বলল, "এবার বলো তো রূপলালভাই কত টাকা পেলে তোমার সুবিধা হয়?"

বিস্মিত অভিভূত রূপলাল বলল, "আমি তোমাদের কাছে বেশি চাইব না খোকাবাবু। শুধু আমার গাড়িভাড়া বাদে সামান্য কিছু হাতখরচা পেলেই হয়ে যাবে। তোমরা আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারবে?"

বাবলু হেসে বলল, "ও তো ট্রেন ভাড়াতেই হয়ে যাবে। পঞ্চাশ টাকায় কী হবে তোমার? তা ছাড়া তোমার মেয়ের অসুখ। তাকে ভাল ডাক্তার দেখাতে হবে।"

"কিন্তু ওর বেশি তোমরাই বা পাবে কোথায় খোকাবাবু? তোমরা যে ছেলেমানুষ।"

বাবলু বলল, "আমরা তোমাকে পাঁচশো টাকা দেব।"

রূপলাল বলল, "তোমরা আমার সঙ্গে রসিকতা করছ না তো খোকাবাবু? আমার যে মাথাটা একদম ঘুরে যাচ্ছে।"

বাবলু বলল, "না রূপলাল ভাই। আমরা মোটেই রসিকতা করছি না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে এতদিন আমরা তোমার মতো একজন মানুষের দেখা পাইনি। দশটা বাজলে ব্যাঙ্ক খুললেই আমি টাকাটা তুলে এনে তোমাকে দেব। ততক্ষণ চলো, তুমি আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটু চা-জল খাবে। আশা করি টাকাটা পেলে আজ রাতের গাড়িতেই চলে যাবে তুমি।"

"সে তো যাবই খোকাবাবু। কিন্তু...।"

"কোনও কিন্তু নয়। ও টাকাটা আমরা তোমাকে ধার হিসেবে দিচ্ছি না। সাহায্য হিসেবেই দিচ্ছি।"

রূপলাল অস্ফুট গলায় বলল, "তোমাদের ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না খোকাবাবু। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

বাবলু হেসে বলল, "একটু আগেই না তুমি বলেছিলে ভগবান নেই?"

"ভুল, ভুল, ভুল বলেছি খোকাবাবু। ভগবান আছেন। মানুষও আছে। সবই ঠিক আছে। দুঃখে-শোকে ভেঙে পড়ে আমরাই শুধু মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলি।"

বাবলু বলল, "আর এখানে দেরি করে লাভ নেই। এসো তুমি আমাদের বাড়ি।"

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা, রূপলাল ভাইকে আমরা আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই না কেন? তুমি বরং ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলে আমাদের বাড়িতে চলে এসো।"

বিচ্ছু বলল,"হ্যাঁ বাবলুদা, আমারও তাই ইচ্ছে।"

"বেশ, তাই হোক। তোরাই তবে নিয়ে যা রূপলালকে। আমি বাড়ি গিয়ে পাশ-বইটা নিয়ে চলে যাই ব্যাঙ্কে।" এই বলে পঞ্চুকে নিয়ে গেল বাবলু।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তখন রূপলালকে নিয়ে কথা বলতে বলতে বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল।

বাচ্চু-বিচ্ছুর মা সব শুনে সাদরে লুচি আলুভাজা ও সন্দেশ খেতে দিলেন রূপলালকে। চা করেও খাওয়ালেন।

তারপর এক সময় টাকা নিয়ে বাবলুও গিয়ে হাজির হল বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে। টাকাটা রূপলালের হাতে তুলে দিতেই যে কী আনন্দ রূপলালের। টাকাটা দুহাতে ধরে বুকে আঁকড়ে ঝরঝর করে কাদতে লাগল সে। আর প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে লাগল। তারপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল রূপলাল।

বাবলুরা ওর চলে যাওয়া পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ওদের সকলেরই মন ভরে উঠল এক গভীর প্রশান্তিতে।

সন্ধের সময় বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে বিলু আর ভোম্বল বসে বসে ওদের পিকচার কমিকস ও অন্যান্য গল্পের বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। কত বই বাচ্চু-বিচ্ছুদের। ওদের বাবা নতুন বই বেরোলেই কিনে দেন। বিলু আর ভোম্বল সেই সব বইয়ের পাতা উলটে ছবি দেখছিল। বাচ্চু রোজের মতো বসেছিল হারমোনিয়াম নিয়ে। বিচ্ছু আপন মনেই বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে গালে পাউডারের পাফ বোলাচ্ছিল।

এমন সময় বেশ ঘর্মাক্ত কলেবরে বাবলু এসে বলল, "নাঃ। অনেক চেষ্টা করেও পেলাম না।"

বাচ্চু হারমোনিয়াম থামিয়ে বলল, "কী পেলে না বাবলুদা?"

বাবলু বিরক্তির সঙ্গে বলল,"অতক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর কিনা শুনতে পেলাম জুন মাসের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত হবে না। বলি, তার পরে কি মরতে যাব?"

বিলু বলল, "এই গরমে তুই কি খেপে গেলি। কী বলছিস বল তো?"

বাবলু বলল, "আমাকে এক গেলাস জল খাওয়া তো বিচ্ছু। আর তোর মাকে বল বাবলুদার খু-উ-উ-ব খিদে পেয়েছে। সেই সঙ্গে এক কাপ চা হলেও মন্দ হয় না।"

বিচ্ছু জল আনতে গেল।

বাবলু নিজের মনেই গজ গজ করতে লাগল বসে বসে। সবাই চুপচাপ। বিচ্ছু জল আনলে বাবলু জল খেল।

বাচ্চু বলল, "তুমি কীসের লাইনে দাঁড়িয়েছিলে বাবলুদা?"

বাবলু সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে এক টাকার একটি কয়েন বার করল। তারপর টাকাটা একবার সবাইকে দেখিয়ে বেশ গম্ভীর গলায় বলল, "এটা কী?"

সবাই বলল, "টাকা।"

"টাকার এ পিঠ?"

"হেড।"

"ও পিঠ?"

"টেল।"

"তা হলে হেড না টেল?"

সবাই বলল, "হেড।"

বাবলু টস করল।

"হেড হেড হেড।"

হেডই হল। বাবলু বলল, "হেড মানে মাথায় অর্থাৎ উঁচুতে। টেল মানে নিচুতে। আমি অবশ্য মনে মনে আন্দাজে এটা ক্যালকুলেশন করে উঁচুটাই বেছে নিয়েছি।"

বাচ্চু বলল, "সত্যি, তুমি পারও বটে বাবলুদা। কখন যে কী মতলব খেলে তোমার মাথায় তা আমরা টেরও পাই না। সেই থেকে আমাদের সাসপেন্সে ঝুলিয়ে রেখে কী যে তুমি বলতে চাইছ তা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। তুমি যেন দিনের দিন কীরকম রহস্যময় হয়ে উঠছ।"

বাবলু বলল, "আরে বাবা এতে রহস্যের কী আছে? এই প্রচণ্ড গরমে একটা কিছু তো বেছে নিতেই হবে আমাদের। হয় হেড, নয় টেল। উঁচুতে অথবা নিচুতে। মানে, পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রে। তা আমি পাহাড়ই বেছে নিলাম। কিন্তু সেই দুপুর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে যখন শুনলাম দার্জিলিং মেলে তিরিশে জুন পর্যন্ত কোনও বার্থ খালি নেই তখন মেজাজটা খিচড়ে যায় কিনা বল।"

বিলু তো শুনেই লাফিয়ে উঠল, "দার্জিলিং মেলে? তার মানে তুই আমাদের দার্জিলিং যাবার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলি নাকি?"

বাবলু মুখ টিপে হাসল।

ভোম্বল বলল, "কই এ কথা তো একবারও আমাদের বলিসনি তুই?"

বাবলু বলল, "বলিনি তার কারণ আগে তো কিছু ঠিক করিনি। রূপলালের মুখে দার্জিলিংয়ের নাম শুনতেই মনটা কীরকম করে উঠল। তাই ওর জন্য সকালে যখন টাকা তুলতে গেলাম তখন একটু বেশি করেই তুললাম। তোদের কিছু জানাইনি তার কারণ ভেবেছিলাম দার্জিলিং মেলের টিকিটগুলো কেটে এনে তোদের হাতে দিয়ে চমকে দেব তোদের। তাই চুপি চুপি দুপুরবেলা নিজেই চলে গিয়েছিলাম ফেয়ারলি প্লেসে। আগামী কালের জন্য পাঁচটা বার্থ চাইলাম। কিন্তু না। থ্রি-টায়ার তো দুরের কথা পাঁচটা সিটও পেলাম না।"

বিচ্ছু বলল, "হায় হায় রে। টিকিটটা পেলে কী মজাই যে হত। তা হলে কালই আমরা আবার দূরপাল্লার ট্রেনে চাপতে পেতাম।"

বাচ্চু বলল, "এই গরমে দার্জিলিং! এ যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ওঃ, যাওয়াটা হলে কী আনন্দই না হত।"

ভোম্বল বিগলিত গলায় বলল, "বাবলু! প্রস্তাবটা তুই না' করে দিস না। সত্যি বলছি ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। দার্জিলিংটা একবার আমাদের ঘুরে আসতেই হবে। নাইবা পেলাম রিজার্ভেশন। এমনিই সাধারণ কামরায় চেপে যাব।"

বাচ্চু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ বাবলুদা। আমরা বিনা রিজার্ভেশনেই যাব।"

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই পারব। আরে, আমরা হচ্ছি পাণ্ডব গোয়েন্দা। আমাদের কি রিজার্ভেশন লাগে? তা ছাড়া কুলিকে দু-চার টাকা দিয়ে দিলে ওরাই বসবার জায়গা করে দেবে।"

বিচ্ছু বলল, "আমার কতদিনের সাধ দার্জিলিং দেখবার।"

বাবলু বলল, "আমারও। দার্জিলিং শুধু যে শৈল শহর তা তো নয়। অনেক ট্যুরিস্টের মতে দার্জিলিং সত্যিকারের ভূস্বর্গ। দার্জিলিং মেঘমালার দেশ। মেঘের মেলা দেখবে তো দার্জিলিং যাও।"

বিলু বলল, "তা হলে বাবলু একটা কথা বলি শোন, কালই আমরা যাই চল। রিজার্ভেশন যখন পাইনি তখন দার্জিলিং মেলেই যে আমাদের যেতে হবে তার কোনও মানে নেই। হাওড়া থেকে নিউজলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার রাত্রের দিকে ছাড়ে। ভিড়ও খুব একটা হয় না। ভাড়াও একটু কম। আমরা ওই গাড়িতেই যাব।"

বাবলু বলল, "না। প্যাসেঞ্জারে আমি যাব না। থ্রি-টায়ার ছাড়াও যাব না।"

বিলু বলল, "তা হলে তো যাওয়াই হবে না।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, যাওয়া হবে। এবং কালই। আমি দার্জিলিং মেলের টিকিট পাইনি বটে তবে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এদিক সেদিক করে কামরূপ এক্সপ্রেসের টিকিট পেয়ে গেছি।"

বিলু লাফিয়ে উঠল, "বলিস কী রে বাবলু! এই কথাটা এতক্ষণ আমাদের কাছে চেপে গিয়ে দার্জিলিং মেলের টিকিট না পেয়ে তুই খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিস এমন ভান দেখাচ্ছিলি?"

বাচ্চু বলল, "সত্যিই তুমি সাসপেন্স ক্রিয়েট করতে পারও বটে বাবলুদা।"

বাবলু বলল, "ওরে, সুখের কথা—আনন্দের কথা একটু তারিয়ে তারিয়ে বলতে হয়। দার্জিলিং মেলে চেপে দার্জিলিং যাবার একটা আলাদা ইমেজ আছে। তবে পেলাম না যখন, তখন হালও ছাড়লাম না। নিউ বনগাইগাও এক্সপ্রেস ও কামরূপ এক্সপ্রেসে চেষ্টা লাগালাম। ভাগ্যক্রমে পেয়েও গেলাম। এতে একদিকে ভাল হল এই যে আমরা তো হাওড়ায় থাকি, হাওড়া স্টেশনেই কামরূপ এক্সপ্রেস পেয়ে যাব। কিন্তু দার্জিলিং মেল হলে কষ্ট করে শিয়ালদায় যেতে হত।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তো বাবলুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়ল।

এমন সময় বাবলুর জন্য খাবার নিয়ে বাচ্চু-বিচ্ছুর মা এসে পড়লেন। ওদের রকম দেখে বললেন, "এ কী রে! এই ভর সন্ধেবেলা সবাই মিলে এমন ভূতের মতো চেঁচাচ্ছিস কেন?"

বাচ্চু বলল, "মা দার্জিলিং।"

"দাজিলিং!"

"বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ। দার্জিলিং।"

"কে যাবে?"

"আমরা যাব।"

"তোরা যাবি!"

"আমরা সবাই দার্জিলিং যাব।"

"কবে?"

"রাত পোহলে ফরসা হলে।"

"তার মানে কাল সকালে?"

"সকালে কী গো! তুমি কিছু জান না। রাত্তিরে যাব। কামরূপ এক্সপ্রেসে।"

বিলুকাব্য করে বলতে লাগল, "আমরা দার্জিলিং যাব। টাইগার হিল দেখব। কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার চুড়োয় আমরা সোনা রোদের ছটা দেখব। পাহাড় দেখব—অরণ্য দেখব—মেঘ দেখব—আরও কত—কত -কত কী দেখব। সত্যি! কী মজা। ওরে সন্ধে তুই রাত্রি হ। ওরে রাত্রি তুই ভোর হ। ভোর তুই সকাল হয়ে যা। দীর্ঘ দিনটা ফুরিয়ে যা তাড়াতাড়ি। আমরা সবাই গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে কামরূপ এক্সপ্রেসের থ্রি-টায়ারে শুয়ে পড়ব। সকাল হবে। নিউ জলপাইগুড়িতে নামব। তারপর? তারপর টয় ট্রেন। আমরা টয় ট্রেনে চাপব। আর টয় ট্রেন ঝিক

ঝিক করে আমাদের নিয়ে যাবে মেঘমালার দেশে। কী চমৎকার—কী অপূর্ব—কী দারুণ ফ্যানস্টাস্টিক।"

বাচ্চু-বিচ্ছুর মা বললেন, "সত্যি, তোদেরই কপাল রে। ভাগ্যে বাবলুকে তোরা পেয়েছিলি?"

বাবলু তখন গপগপ করে হালুয়া ও পরোটা খেয়ে চলেছে।

বাচ্চু বলল, "মা, আমাদের নেই?"

"আছে মা। সবার আছে। ওর খুব খিদে পেয়েছিল তো, তাই সবার আগে ওকেই দিলাম। তোদের জন্য আনছি।"

বাচ্চু-বিচ্ছুর মা ঘর থেকে চলে গেলে আনন্দের চোটে ভোম্বল ঘরের মেঝেতেই একটা ডিগবাজি খেয়ে নিল।

পর দিন যথাসময়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা হাওড়া স্টেশনে এসে উপস্থিত হল। বাবলু-বিলু ভোম্বল-বাচ্চু-বিচ্ছু সবাই আছে। পঞ্চুও আচ্ছে।

কিন্তু মুশকিল হল পঞ্চুকে নিয়ে। সন্ধে-রাতের গাড়ি। স্টেশন একেবারে ভিড়ে জমজমাট। ওকে প্লাটফর্মে ঢোকাবে কী করে?

বাবলু বলল, "এক কাজ করি আয়, একবার এনকোয়ারিতে জিজ্ঞেস করে আসি, প্রপার চ্যানেলে ওকে নিয়ে যাওয়া যায় কি না।" এই বলে বাবলু চলে গেল। তারপর মিনিট কয়েকের মধ্যেই হাসিমুখে ফিরে এসে বলল, "হয়েছে। পঞ্চুর একটা টিকিট থাকলেই হবে। তবে ওকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ব্রেক ভ্যানে চাপাতে হবে।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। একটা রাত তো। যা ওর টিকিটটা কেটে আন। অযথা আর সঙ্গে নিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।"

বাবলু বলল, "ওর টিকিট আমি কেটেই এনেছি। কিন্তু পঞ্চু আমাদের সঙ্গে থাকবে না এটা কি ভাবা যায়?"

ভোম্বল বলল, "তা অবশ্য যায় না। কিন্তু এইরকম ভিড়ের গাড়িতে অন্যান্য যাত্রীরা যদি আপত্তি করে তা হলে সেটাও কি সহ্য করতে পারব আমরা?"

বিলু বলল, "ঠিক আছে। আগে ট্রেনে উঠি চল। তারপর যদি কোনওরকমে কোচ অ্যাটেন্ডেন্টকে একটু রাজি করাতে পারি তা হলে পঞ্চুকে আমাদের কাছেই রেখে দেওয়া যাবে।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল।"

ওরা পাঁচজন গেট পার হয়ে পঞ্চুকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

উঃ! সে কি প্রচণ্ড ভিড় প্লাটফর্মে। এবং ট্রেনে। এই সব ট্রেনে যে এত ভিড় হয় বাবলুর তার জানা ছিল না। যত না লোকের ভিড় তার একশো গুণ মালপত্তরের ডাই।

রিজার্ভেশন থাকা সত্ত্বেও বাবলুরা অতি কষ্টে ট্রেনে উঠে নিজেদের সংরক্ষিত বার্থগুলো দেখে নিল। তারপর সবাইকে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে বাবলু কোচ অ্যাটেন্ডেন্টকে বলল, "স্যার, অনুগ্রহ করে আপনি আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?"

"বলো?"

"আমাদের সঙ্গে একটা কুকুর আছে। ওর একটা টিকিটও করেছি। ওকে আমরা আমাদের কাছেই রাখতে চাই। আপনি আপত্তি করবেন না তো?"

"হ্যাঁ করব। কেন না যাত্রী গাড়িতে এভাবে কুকুর নিয়ে যাওয়া যায় না। ওকে ব্রেক ভ্যানে রেখে আসতে হবে।"

"ও কিন্তু খুব লক্ষ্মী। কাউকে কামড়ায় না। চুপচাপ শুয়ে থাকে।"

"তা হলেও নয়। লাইনের অবস্থা খুব খারাপ। যদি মাঝ রাতে মোবাইল চেকিং হয় তখন কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে। পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। যাও, তাড়াতাড়ি ওকে ব্রেক ভ্যানে তুলে দিয়ে এসো। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে।"

বাবলু আর কী করে? অগত্যা পঞ্চুকে রেখে আসতে চলল। ও যখন দরজার কাছে গেছে তখন হঠাৎ কী ভেবে যেন অ্যাটেন্ডেন্ট ভদ্রলোক ডাকলেন ওকে, "খোকা শোনো, তুমি এক কাজ করো। ওকে বরং বার্থের তলাতেই শুইয়ে রাখো। কেন না আর মাত্র এক মিনিট সময় আছে। ট্রেন ছেড়ে দিলে আর উঠতে পারবে না।"

বলতে বলতেই ছেড়ে দিল ট্রেন।

কী আনন্দ! কী আনন্দ !

বাবলু পঞ্চুকে একেবারে নীচে না রেখে বার্থের ওপর তুলে নিল। পর পর বার্থ ওরা পায়নি। তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতে হল। তা হোক। তবু একদিনের মাথায় বার্থ যে পাওয়া গেছে এই যথেষ্ট। দার্জিলিং মেলে তো সিটিংও জুটল না। একটা রাত দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

হাওড়া থেকে ছাড়ার পর ব্যান্ডেল কালনা নবদ্বীপ হয়ে ট্রেন চলল। বাবলুর মা লুচি মাংস আর কড়া পাকের সন্দেশ দিয়েছিলেন। তাই খেয়েই চুপচাপ শুয়ে রইল ওরা।

অজগর সাপের মতো লম্বা কামরূপ এক্সপ্রেস ডিজেল ইঞ্জিনের টানে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল। ট্রেনের দুলুনিতে ওদের সবারই চোখে নেমে এল ঘুম-ঘুম-ঘুম।

২

ঘুম যখন ভাঙল তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হচ্ছে। অনেক দূরের তিস্তা উপত্যকা ও আবছা মেঘের মতো শৈলশ্রেণী ছবির মতো দেখা যেতে লাগল।

ট্রেন এসে থামল নিউ জলপাইগুড়িতে।

একটু আগেই দার্জিলিং মেল এসে পৌঁচেছে।

একজন চেকার ওদের টিকিট দেখতে চাইলেন।

বাবলু টিকিট দেখাল।

চেকার ভদ্রলোক টিকিট দেখেই বললেন, "তোমরা দার্জিলিং যাত্রী নাকি?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"তা হলে শিগগির যাও। টয় ট্রেন এখনই ছেড়ে দেবে। সময় হয়ে গেছে।"

"ছাড়ে ছাড়বে। এ ট্রেন না হলে পরের ট্রেনে যাব।"

"এর পরে দার্জিলিং যাবার আর কোনও ট্রেন নেই। সারাদিনে এই একটাই মাত্র ট্রেন।"

তাই না শুনে ওরা তো ওভারব্রিজ পার হয়ে হইহই করে ছুটল। কিন্তু না। যার জন্য আসা সেই টয় ট্রেন তখন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাবলুরা অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারল না ট্রেনটাকে।

বাচ্চু-বিচ্ছুর চোখদুটি জলে ভরে উঠল।

বাবলু বলল, "যাঃ। ভ্রমণের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল আমাদের। এখানে এসে টয় ট্রেন চেপে যদি না দার্জিলিং যেতে পারলাম তা হলে আর লাভ কী? কত সাধের, কত স্বপ্নের টয় ট্রেন। সেই টয় ট্রেনেই চাপতে পারলাম না!"

ট্রেনটাকে তখনও নাগালের বাইরে দেখা যাচ্ছে একরাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ছুটে চলেছে ঝিক ঝক করে।

ওদের আশা আনন্দ উল্লাস ও উচ্ছাসকে স্নান করে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

বিলু বলল, "তা হলে উপায়?"

বাবলু বলল, "কোনও উপায়ই নেই। বাসে যেতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "না। কিছুতেই বাসে চেপে আমরা দার্জিলিং যাব না। আমরা টয় ট্রেনেই চাপব। আজকের দিনটা বরং এইখানেই থেকে কাল সকালের ট্রেনে যাব।"

বাচ্চু বলল, "বাঃ বাঃ বেশ কথা। এদিকে টিকিটগুলো যে নষ্ট হয়ে যাবে সে খেয়াল আছে?"

ভোম্বল বলল, "নষ্ট হবে কেন, ব্রেক জার্নি লিখিয়ে নেব। আর নষ্ট হলেও নতুন করে টিকিট কেটে নেব সেও ভাল। তবু জীবনে প্রথম দার্জিলিং যাচ্ছি, টয় ট্রেন ছাড়া যাব না।"

বিলু বলল, "কিন্তু এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে স্টেশন। এখানে পড়ে থাকবি কী করে?"

"যেভাবেই হোক থাকব।"

ওরা যখন এই সব বলাবলি করছে তখন সম্ভ্রান্ত ভদ্র চেহারার একজন স্মার্ট যুবককে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। যুবকটি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিল ওদের। এবার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী হল? ট্রেনটা ধরতে পারলে না?"

বাবলু হতাশ গলায় বলল, "নাঃ।"

"কোথায় যাবে তোমরা দার্জিলিং নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে এক কাজ করো তোমরা। বাসেই চলে যাও। এখান থেকে দুটো রিকশা করে শিলিগুড়ি যাও। ওখান থেকে কুড়ি মিনিট অন্তর মিনিবাস পাবে।"

বাবলু বলল, "না। মিনিবাসে গেলে তো ঝামেলা চুকেই যেত। এই প্রথম দার্জিলিং যাচ্ছি আমরা। কত সাধ কত স্বপ্ন আমাদের টয় ট্রেনে যাব, এখন তো শুনছি সারাদিনে আর কোনও ট্রেনই নেই। তাই ভাবছি এখানেই স্টেশনে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে টয় ট্রেনে যাব।"

বাবলুর কথা শুনে যুবকটি হেসে বলল, "পাগল নাকি? সামান্য টয় ট্রেনে চাপবার জন্য আজকের সারাটা দিন সারাটা রাত এই খাঁ খাঁ নিবান্ধাপুরীতে পড়ে থাকবে?"

বিলু বলল, "তা ছাড়া উপায় ? মাত্র সকালে একটা ট্রেন ছাড়া সারাদিনে আর কোনও ট্রেন থাকবে না তা কে জানত?"

"হ্যাঁ। সারাদিনে এখন দার্জিলিং যাবার একটিই মাত্র ট্রেন। তার কারণ টয় ট্রেন চালিয়ে সরকারের দারুণ লোকসান হচ্ছে। কেউ টিকিট কাটে না। শুধু বহুদিনের পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রাখবার জন্য ট্রেনটাকে আজও উঠিয়ে দেওয়া হয়নি। লোকসান দিয়েই চালানো হচ্ছে। তা ঠিক আছে। তোমরা ক'জন? পাঁচজন তো? আর এই কুকুরটা। আমার সঙ্গে স্টেশনের বাইরে এসো। আমার মোটরবাইকটা রেখে এসেছি। দেখি একবার চেষ্টা করে তোমাদেরকে শিলিগুড়িতে নিয়ে গিয়ে ট্রেনটা ধরিয়ে দিতে পারি কি না।"

বাবলুরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

যুবকটি ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, "এসো এসো। আর দেরি কোরো না।" বলেই হন হন করে এগিয়ে চলল। যেতে যেতেই বলল, "যদি ট্রেন ধরাতে না পারি তা হলে বাসস্ট্যান্ডে পৌছে দেব। ওখান থেকে বাসেই চলে যেয়ো।"

বাচ্চু ফিসফিস করে বলল, "না বাবলুদা। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এই পরিবেশে ঝট করে এই রকম একজনের খপ্পরে পড়ে যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। তবে আমরা একসঙ্গে সকলেই থাকছি তো। তা ছাড়া ওটাও আছে সঙ্গে। বেকায়দা বুঝলেই চালিয়ে দেব টিসুমে ঢুসুম। একটু রিসক নিয়ে দেখিই না।"

বিলু বলল, "লোকটিকে দেখে তো খারাপ বলে মনে হচ্ছেন। তবু দেখাই যাক। উদ্দেশ্য সৎও হতে পারে।"

ওরা স্টেশনের বাইরে এল। যুবকটি তখন বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছে। বেশ বড় সড়। কী যেন নাম বাইকটার। রয়্যাল এনফিল্ড বুলেট না কী যেন।

বাচ্চু-বিচ্ছু পঞ্চুকে নিয়ে সামনের দিকে পেট্রল ট্যাঙ্কের ওপর বসল। আর বিলু, ভোম্বল পিছন দিকে। বাবলু পঞ্চুকে আর মালপত্র সঙ্গে নিয়ে চেপে বসল সাইডকারটার মধ্যে।

যুবকটি ওদের নিয়ে ভট ভট শব্দে বাইকটিকে পিচ ঢালা পথের ওপর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলল। একবার শুধু জিজ্ঞেস করল, "শক্ত করে ধরে আছ তো সব? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না?"

বাবলুরা বলল, "না।"

বাচ্চু বলল, "তবে মাঝে মাঝে মোড়ের মাথায় টার্ন নেবার সময় মনে হচ্ছে এই বুঝি উলটে যাব।"

যুবক হাসল। বলল, "এত সোজা?"

বাবলু বলল, "আপনার তো পরিচয়ই পেলাম না। আপনি থাকেন কোথায়?"

"আমি থাকি জলপাইগুড়ি শহরে। আমার এক রিলেটিভের আসবার কথা ছিল। তাকে নিতে এসেছিলাম। তিনি আসেননি। তাই ফেরার সময় তোমাদের

দেখে খুব কৌতুহল হল। টয় ট্রেনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করছিলে দেখেই বুঝলাম দার্জিলিং যাত্রী তোমরা। তবে তোমাদের সঙ্গে কোনও অভিভাবক নেই দেখে একটু অবাকও হলাম। একেবারে ছেলেমানুষ তোমরা। বড় একজন কাউকে সঙ্গে না নিয়ে এইভাবে দূর ভ্রমণে বেরিয়ো না। দিনকাল খুব খারাপ।"

বাবলু বলল, "আমাদের ঘোরা অভ্যাস আছে।"

"বাঃ। ভেরি গুড। দার্জিলিংয়ে তোমরা কোথায় উঠবে কিছু ঠিক করেছ?"

"না। যেখানে সুবিধে বুঝব সেখানেই উঠব।"

"তোমরা এক কাজ করো। ম্যালের কাছে হোটেল প্রিন্সে উঠো। ওখানে গিয়ে বলবে সমাজপতিবাবু আমাদের পাঠিয়েছেন। তা হলেই হবে। খুব কম খরচে থাকতে পাবে তোমরা।"

"আপনার চেনা জানা হোটেল বুঝি?"

"আমার ভগ্নিপতির হোটেল।" বলতে বলতেই শিলিগুড়ি এসে গেল। স্টেশনের সামনে ওদের সবাইকে নামিয়ে দিয়ে যুবক বলল, "তোমাদের সঙ্গে সারাদিনের মতো খাবারদাবার আছে তো?"

বাবলু বলল, "না নেই।"

"তা হলে শিগগির কিছু কিনে নাও। না হলে পাহাড়ি পথে কোথাও কিছু পাবে না।"

"কিনতে হলে দেরি হয়ে যাবে না?"

"না। ওই তোমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। গার্ডসাহেব চা খাচ্ছেন।"

বিলু বলল, "এই স্টেশন? এত ছোট্ট?"

"এই রকমই। এর পরের স্টেশনগুলো আরও ছোট।"

বাবলু চট করে কয়েকটা পাউরুটি আর কলা কিনে নিল। তারপর যুবককে অভিবাদন জানিয়ে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর পঞ্চুকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ট্রেনে উঠে পড়ল।

কী ছোট্ট ট্রেন। বাবলুরা যে কম্পার্টমেন্টে উঠল সেটি একেবারে ফাঁকা। তবে খুব ছোট। এক পাশে জানলার ধারে একজন পাগল পাগল চেহারার নেপালি ভুটিয়া গোছের মধ্যবয়সি লোক বসেছিল। বাবলুরা তার বিপরীত দিকের জানলার ধার দখল করল। ওদের কথাবার্তায় চঞ্চলতায় একটু যেন বিরক্ত হল লোকটি। তবুও এক সময় জিজ্ঞেস করল, "কাহা যা রহে? দার্জিলিং?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"ইসমে তো বহৎ দের লাগেগা। বাস মে চলা যাও।"

বাবলু বলল, "আমরা সিন সিনারি দেখব বলে টয় ট্রেনে যাচ্ছি। বাসে যাব কেন?"

"আরে ইঞ্জিন বিগড় গয়া। বহৎ দের লাগেগা ইসমে।"

বিলু বলল, "তা হলে আপনি চলে যান না বাসে।"

"ম্যায় নেহি যাউঙ্গা।"

ভোম্বল বলল, "তবে ফালতু বকোয়াস না করে চুপচাপ বসে থাকুন।"

লোকটি ভোম্বলের দিকে একবার ক্রুদ্ধ নজর বুলিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

বাবলু বলল, "একেই বলে কপাল। এত কাণ্ড করে এখানে এলুম আর ইঞ্জিনটাই গেল বিগড়ে?"

ভোম্বল বলল, "বেগড়াক। তবু টয় ট্রেনে তো চেপেছি। যখন হোক পৌঁছুবে তো?"

ওর কথা শেষ হতে না হতেই ঘটি বাজল স্টেশনে। গার্ডের হুইসিল এবং ইঞ্জিনের সিটিও শোনা গেল। ই-ব-বি-ই-ব। তারপর ভূমিকম্পের মতো একটা ঝাঁকানি। এবং তারও পরে আচমকা তড়বড়িয়ে ছোট। মনের আনন্দে নেচে নেচে দুলে দুলে বিচিত্র শব্দ তুলে ছুটে চলল ট্রেন। ঘং ঘং ঘট্টাং। ঘং ঘং ঘট্টাং। খং খং খট্টাং।

বাবলুদের আনন্দের আর সীমা রইল না। ট্রেন খানিকটা যাবার পর কত নেপালি ভুটানি ও টিবেটিয়ান ছেলেমেয়েকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখা গেল। তারা দল বেঁধে হইহই করতে করতে এসেই চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরে উঠে পড়ল। কেউ ভেতরে ঢুকে নাচতে লাগল, কেউ হাত নেড়ে গান গেয়ে ঝুলতে লাগল, কেউ ট্রেনের গা বেয়ে এ কামরা থেকে ও কামরায় যেতে লাগল এবং কেউ লাফিয়ে ট্রেন থেকে নেমে ছুটে ছুটে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে আবার চলন্ত ট্রেনে উঠতে লাগল। এটা খুবই বিপজ্জনক খেলা। তবে এ খেলায় এরা অভ্যস্ত। তাই কেউ পড়েও যায় না। কারও হাত পাও ভাঙে না। তাই বুঝি এর নাম হয়েছে টয় ট্রেন। অর্থাৎ কিনা খেলা গাড়ি। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এই রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল এবং দু-তিন বছরের মধ্যেই শেষ হয়েছিল। সেই থেকেই ট্রাডিশন বজায় রেখে চিরশিশুর দল এই খেলা খেলে আসছে। ওদের ওই খেলা দেখে পঞ্চুরও তো মাথার পোকা নেড়ে উঠল। তার ওপর একটি ভুটিয়া ছেলে পঞ্চুর শাখের মতো মুখখানি ধরে চুমু খেয়েছে। সেই আনন্দে পঞ্চু তো ওদের সঙ্গে দারুণ দাপাদাপি শুরু করে দিল। সেও ওদের সঙ্গে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে ইঞ্জিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে। কখনও ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। খেয়ে গা ঝেড়ে থমকে দাঁড়ায়। ট্রেনটাকে একটু এগিয়ে যেতে দেয়। তারপরই তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে নেচে আবার ট্রেনটাকে ধরে ফেলে। পঞ্চুকে নিয়ে তো ছেলের দল তাই মেতে উঠল খুব। সে কী হইহই রইরই কাণ্ড ।

বাবলুও মনের আনন্দে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মাউথ অর্গান বাজাতে লাগল। আর পঞ্চুর কীর্তি দেখতে লাগল।

টয় ট্রেন যতই অগ্রসর হচ্ছে ছায়াছবির দৃশ্যের মতো ততই পট পরিবর্তন হচ্ছে। ওদের চোখের সামনে একের পর এক জীবন্ত প্রকৃতিরানি যেন অপরূপ সাজে ধরা দিতে লাগল। ছোট্ট টয় ট্রেন আপন মর্জিতে যেন আহ্লাদে আটখানা

হয়ে একে বেঁকে ঘুরে চলেছে। বাস্তবিকই এই পার্বত্য রেলপথ যেন প্রযুক্তি বিদ্যার গৌরবের নিদর্শন। বাবলুদের মনে হল ওরা যেন এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্য দিয়ে টয় ট্রেনে চেপে অগ্রসর হচ্ছে। ওদের ডাইনে বামে সম্মুখে পশ্চাতে একটি ভ্রাম্যমান চিত্র যেন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চলেছে।

বাবলুদের এই আনন্দ, অন্যান্য ছেলেগুলোর পঞ্চুকে নিয়ে এই হই হুল্লোড় সহ্য হচ্ছিল না একজনের। সেই পাগল পাগল চেহারার যে লোকটি ওপাশের জানলার ধারে বসেছিল তার।

বাবলু একটু লক্ষ করে দেখল লোকটির চোখ মুখের ভাব ভাল নয়। এতক্ষণ ওর দিকে নজর দেয়নি ওরা। কিন্তু বেশ ভাল করে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বাবলু লক্ষ করল লোকটি মোটেই পাগল নয়। বেশ বলবান এবং সাংঘাতিক। একটা নৃশংসতা যেন ওর চোখে-মুখে খেলা করছে।

বাবলুকে ওইভাবে বার বার তাকাতে দেখে বিলুও লোকটির দিকে মনোযোগ দিল। বিলু এক চোখ টিপে বাবলুকে একটু ইশারা করে যেচেই আলাপ জমাতে গেল লোকটির সঙ্গে। বিলুই গায়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথায় যাবেন দাদা?"

লোকটি বিরক্তির সঙ্গে বলল, "ক্যা বোলতা?"

"বলছি কোথায় যাচ্ছেন আপনি?"

"দার্জিলিং।"

বিলু বলল, "দার্জিলিংয়ে আপনার বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

বাবলু বলল, "আপনি নেপালি না দার্জিলিংয়ের লোক?"

"ক্যা মতলব?"

"মতলব কিছু নয়। এমনই জিজ্ঞেস করছি। আপনি কি নেপাল দেশের লোক?"

লোকটি এবার গলার স্বর অসম্ভব রকমের গম্ভীর করে বলল, "হাঁ মেরা নাম প্রেমা তামাং।"

"প্রেমা তামাং?"

"হ্যাঁ। প্রেমমাত্তাম্মাং।" ;

মহানদীর সেতু পার হয়ে টয় ট্রেন শুকনা স্টেশনে এসে থামল। এইখানে অরণ্যানীর কী শোভা যতদূর চোখ যায় শুধু শাল সেগুন ও নাম-না-জানা সুবৃহৎ গাছের সমারোহ। শুকনা থেকে ছেড়ে পাঁচফিল অতিক্রম করার পর একটি লুপের মুখে পড়ল ট্রেন। অন্যান্য ছেলেগুলো টুপটাপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল এখানে। এই পথে এইটেই প্রথম লুপ লুপ হচ্ছে অনেকটা ফাসের মতো পর্বতগাত্র বিদীর্ণ করে প্রসারিত। যেখানে পর্বত বেষ্টন করে খুব অল্প আয়াসে টয় ট্রেনকে উঁচুতে ওঠবার পথ করে দেওয়া হয়েছে।

মাউথ অর্গান বাজাতে বাজাতে বাবলুও সেই ছেলেগুলোর মতো লাফিয়ে নামল ট্রেন থেকে। তারপর ছুটতে ছুটতে লুপের অপর প্রান্তে গিয়ে ডাকল, "প—ন—চু—উ—উ—।"

আর যায় কোথা। পঞ্চুও অমনই এক লাফে নেমে এল ট্রেন থেকে। তারপর লেজ নেড়ে কোমর নেড়ে সে কী নাচুনি।

লুপে পাক খেয়ে ট্রেনটা ঘুরে ওদের দিকে আসতেই আবার ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে ট্রেনে ওঠা। সে কী দারুণ আনন্দ। এইভাবে এই পাহাড়-জঙ্গলে টয় ট্রেন থেকে ওঠা নামা খুব মজার ব্যাপার। তবে এবারে শুধু বাবলু আর পঞ্চুই ট্রেনে উঠল। সেই ছেলের দল আর এল না।

বাবলু আর পঞ্চু ট্রেনে উঠতেই প্রেমা তামাং বলল, "অ্যায়সা মাৎ করো। ইয়ে বহত খর্তারনক হ্যায়। খাদ মে গির পড়ো তো একদম হাপিস হো যাওগে।"

বাবলু কিছু না বলে সিটে এসে বসল।

প্রথম লুপ পার হবার পর রংটং স্টেশন এল। এখানকার স্টেশনগুলো খুবই ছোট্ট। আর বেশ মজাদার। যেন একটা তাসের ঘর অথবা টি-স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে খেলনা গাড়ি। ট্রেন এখানে অনেকক্ষণ থামল। কোঁৎ কোৎ করে জল খেল। তারপর আবার ছাড়ল।

ট্রেন ছাড়ল। ছেড়েই ছাগল ছানার মতো এমন লাফাতে লাগল যে মনে হল হয় পাহাড় থেকে পড়ে যাবে নয়তো এখুনি পাহাড়চূড়োয় উঠে পড়বে।

বিলু বলল, "সত্যি! এত মজা উপভোগ করা যায় বলেই শহরের লোক ছুটিছাট পেলে দার্জিলিং-দার্জিলিং করে।"

লুপ ছাড়াও পাহাড়ের উচ্চস্থানে ওঠার জন্যে আরও এক মজার ব্যাপার আছে। সেটা হল জিগজ্যাগ। জিগজ্যাগে পড়ে ট্রেনটা একবার এগোয় একবার পিছোয়। এই সম্বন্ধে যে মজার ঘটনাটা আছে তা হল, স্যার অ্যাসলি ইডেন ও মিস্টার ফ্র্যাঙ্কলিন প্রেস্টেজ তো এই রেলপথ পেতেছিলেন। যখন অনেক পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় নিয়ে এই লাইন পাতা হচ্ছিল তখন পাহাড়ের বেশ কিছুটা ওঠার পর কাজ আটকে গেল। পাহাড়ের গা বেয়ে চক্কর কেটেও ওঠা যায় না এবং দু'ধার কেটে মাঝখান দিয়েও যাওয়া যায় না। আর এমন কোনও সমতল জায়গা নেই যেখানে লুপ তৈরি করে নিয়ে যাওয়া যায়। কাজেই কাজ গেল বন্ধ হয়ে। সাহেবদের মাথা গেল খারাপ হয়ে। বাড়ি এসেও সেই একই চিন্তা মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল। ডিনারের সময় হয়েছে। সাহেবকে চিন্তিত দেখে দুই সাহেবের কার যেন মেমসাহেব বললেন, কী এত ভাবছ বলো তো? সাহেব বললেন, 'কী আর ভাবব বলো, সামনে যে একদম এগোতে পারছি না।' মেমসাহেব হেসে বললেন, তা হলে পিছিয়ে এসো।' এই সামান্য কথাতেই সাহেবের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সাহেব তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, "ঠিক বলেছ। পিছিয়েই আসি। পরদিন রাত থাকতেই সাহেব কর্মস্থলে গিয়ে শুরু করে দিলেন কাজ। রেলপথের ইতিহাসে এক নতুন জিনিস তৈরি হল। যার

নাম রিভার্স। অর্থাৎ সাধারণ লোকে যাকে বলে জিমজ্যাগ। পাহাড়ে ওঠার মুখে ট্রেন এসে আর পথ না পেয়ে থেমে পড়ে এক জায়গায়। পয়েন্টম্যান নিশান হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। লাইন বদলে আবার পিছনে হটে যাবার নির্দেশ দেয়। এরপর আবার বদলে দেয় পয়েন্ট। এই করতে করতে ওপরে ওঠে ট্রেন। এবং পরে স্বচ্ছন্দে চলতে থাকে। জিগজ্যাগ পেরিয়ে আবার চক্রে পড়ল ট্রেন। তারপর চুনভাটি স্টেশনে এসে থামল। ট্রেন এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। মিনিট দুয়েক থেমেই ছেড়ে দিল। চুনভাটির পর তিনধারিয়া।

তিনধারিয়ায় বেশ কিছুক্ষণ থামল ট্রেন। বাবলুরা সবাই নামল। বাবলু লক্ষ করল প্রেমা তামাং যেন আরও গম্ভীর হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে। আর মাঝে মাঝে আড়চোখে-দুখছে ওদের।

বিলু বলল, "মনে হচ্ছে লোকটা মনে মনে কোনও মতলব ভাজছে।"

ভোম্বল বলল, "ভাঁজুক। ভেজে করবে কী?"

এমন সময় বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আরে! এ কী মজা। দেখ দেখ বাবলুদা। এখানে আরও দুটো এই রকম ছোট ছোট ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।"

বাবলু কেন, সবাই সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল। ওখানকার একজন পাহাড়ি লোক ওদের বিস্মিত হতে দেখে বলল, "এটা আসলে একটাই ট্রেন। তিন চারখানা বগি নিয়ে তিনটি ইঞ্জিন। এগুলো তিনধারিয়ায় এসে একত্রিত হয়। এবং পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর ছেড়ে দার্জিলিংয়ে পর পর গিয়ে পৌছয়।"

বাবলুরা ট্রেন দেখে চারদিকের প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল। সামনের ট্রেনদুটোয় বেশ ভিড় আছে। তাই বাবলুদেরটা ফাঁকা। যাই হোক, দূরের পাহাড়গুলো দেখে বাবলুর কেমন যেন মনে হল। প্রেমার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ওই যে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে ওখানেই কি দার্জিলিং?"

প্রেমা গম্ভীরভাবেই বলল, "নেহি ও পাহাড় ভুটান কা।"

"তাই নাকি?"

ওরা সকলেই মুগ্ধ চোখে দূরের ভুটান রাজ্যের গিরিশ্রেণী এবং নীচের তিস্তা উপত্যকা ও রজতরেখা তিস্তাকে দেখতে লাগল। এখান থেকে হাজার ফুটেরও বেশি নীচে রুপোলি ফিতের মতো তিস্তাকে কী সুন্দর যে দেখাল তা ভোলবার নয়।

তিনধারিয়া থেকে ট্রেন ছেড়ে মন্থরগতিতে চলে ওরা চতুর্থ লুপে এসে পড়ল। এই লুপটিই বৃহত্তম লুপ। এখান থেকে ওরা শিটং পর্বতশৃঙ্গ দেখতে পেল।

এরপর গয়াবাড়ি।

বাবলু বলল, "জনিস তো এখানেই সেই বিখ্যাত পাগলাঝোরা!"

ভোম্বল বলল, "পাগলাঝোরা? সেটা কী"

বিচ্ছু বলল, "একটা জলপ্রপাত।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। পাগলাঝোরা হল একটি জলপ্রপাত। এখন এর কীরকম অবস্থা জানি না। তবে শুনেছি বর্ষায় নাকি এর উদাম ও উচ্ছল গতি দেখবার মতো বেড়ে ওঠে। গম্ভীর নদীর জলস্রোত শিলাখণ্ড থেকে শিলাখণ্ডে পাগলের মতো নৃত্য করে।"

বিলু বলল, "ট্রেনটা কতক্ষণ থামবে এখানে? গিয়ে দেখে এলে হয় না?"

ভোম্বল বলল, "তারপর কোনওরকমে দেরি হয়ে গেলে ট্রেনটা ছেড়ে দিক আর কী।"

বলতে বলতেই ছেড়ে দিল ট্রেন। বাবলু বলল, "ট্রেন ছাড়লেও ভয়ের কিছু নেই। খুব ঘন ঘন দার্জিলিংয়ের বাস যাচ্ছে এ তো দেখতেই পাচ্ছি। বাস রাস্তাও রেলপথের গায়ে গায়ে।"

বাচ্চু বলল, "ট্রেন ভ্রমণ ভালই লাগছে। তবে বড্ড দেরি হয়। ফেরার সময় আমরা বাসে ফিরব। কী বলো বাবলুদা?"

বিচ্ছু বলল, "ফেরার কথা পরে। এখন যাই তো।"

ভোম্বল বলল, "এবার একটু খাওয়া-দাওয়া করে নিলে কেমন হয়? বড্ড খিদে লাগছে।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। ঘোরার আনন্দে এতক্ষণ খাওয়ার কথাই মনে ছিল না।"

বাবলু প্রত্যেককে রুটি আর কলা ভাগ করে দিল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে দিয়ে নিজের রাখল। পঞ্চুকেও দিল। পঞ্চুর কী হল কে জানে, কলাটা শুকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। শুধু রুটিটাই খেতে লাগল কাউ কাউ করে।

ট্রেন থামল মহানদীতে। তারপর কার্শিয়াঙে। প্রেমা তামাং নেমে গেল এখানেই!

বাবলু বলল, "ওঃ বাঁচলাম। লোকটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না।"

বিলু বলল, "আমিও। ওর চোখদুটো দেখেছিস? পাক্কা শয়তানের চোখ।"

ভোম্বল বলল, "মনে হয় যেন খুনের আসামী।"

এখানে ট্রেন থেকে বহুলোক নামল। বাবলুরাও নেমে পড়ল তাই। বাবলু ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "ট্রেন এখানে কতক্ষণ থামবে?"

ড্রাইভার বলল, "কম সে কম দেড় দো ঘণ্টা রোখেগা। যাও সব হোটেলমে যাকে খানা পিনা কর লো।"

বাবলুরা তো সবে খেয়েছে, কাজেই খানা পিনার আর দরকার হল না। একটা দোকান থেকে শুধু চা কিনে খেল। হায়রে! কী বিচ্ছিরি স্বাদ সেই চায়ের। চায়ের দেশের চা যে এত জঘন্য হয় তা কে জানত? যাই হোক, এখানে চা খেয়ে ওরা পাহাড়ের ঢালময় বিস্তৃত চা বাগান দেখতে লাগল। সেই চা বাগানে ভুটানি মেয়েরা কেমন চা সংগ্রহ করছে। দৃশ্যটা দেখতে খুবই ভাল লাগল ওদের। তা ছাড়া কার্শিয়াং শহরটাও মন্দ নয়। পাহাড়ের ওপরে সাজানো গোছানো ছোট্ট শহর। আর এখানকার আবহাওয়াও খুব ভাল। না গরম না ঠান্ডা। বেশ

আরামদায়ক। এই গরমের দিনে এমন তাপহর পরিবেশ মনকে যেন কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল।

যথাসময়ে ছাড়ল ট্রেন। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগা লম্বা ছুঁচলো দাড়ি মাথায় টুপি পরা এক ভদ্রলোককে একটি বড় অ্যাটাচি হাতে ট্রেনে উঠতে দেখা গেল। ভদ্রলোক উঠে ঠিক যেখানে প্রেমা তামাং বসেছিল সেখানে বসলেন।

এমন সময় বাবলুই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ওই ও-ই ওই দ্যাখ— কাঞ্চনজঙ্ঘা।"

কার্শিয়াং ছাড়তেই ট্রেনের কামরায় বসে হিমালয়ের গিরিশ্রেণী ও কাঞ্চনজঙ্ঘার এমন তুষারশুভ্র রূপ যে ওরা দেখতে পাবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। দূরে নেপাল রাজ্যের পর্বতমালা। গোখসেনারক্ষিত ইলাসের সীমান্ত দুর্গ ও ঠিক পিছনেই আলোছায়ামণ্ডিত সমতলের দৃশ্য যেন এক স্বপ্নরাজ্য। এখানে চারদিকেই মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। দার্জিলিং তো মেঘমালার দেশ। ঘরের ভেতর মেঘ ঢুকে বৃষ্টি নামায়। সেই মেঘের শুরু কি এখান থেকেই? এখানকার গিরিগাত্রে মেঘেরা যেন খেলা করছে। সাদা মেঘ নয়। ঘন কালো বৃষ্টির মেঘ। মেঘের এই লীলায়িত গতিতে যে কত সৌন্দর্য আছে তা না দেখলে জানা যাবে না। দূরে নীল আকাশপটে তরঙ্গায়িত হিমালয় পর্বতশ্রেণী ও রজত-মুকুটের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাছেই ঘন শ্যামনীল গিরিমালা। আশপাশে কলনাদী ঝরনা ও পাখির কুজন কূজিত জঙ্গলের ভয়াবহ শোভা। এরই মাঝে মেঘের লুকোচুরি। এ যে না দেখল তার জীবনই বৃথা।

বাবলুরা অবাক বিস্ময়ে সব দেখল। এরই মাঝে একটা স্টেশনে বুড়ি ছোয়া করল ট্রেন। নাম টুং টুং পেরোতেই পড়ল সোনাদার ভীষণ অরণ্যানী। এই অরণ্য আগে নাকি আরও ভয়াল ভয়ংকর ছিল।

এমন সময় ওপাশের দরজার দিক থেকে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল, "এ কী দুবেজি। তবিয়ত ঠিক হ্যায় তো?"

দুবেজি তখন খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওরা দেখল দরজার হাতল ধরে মূর্তিমান যমের মতো দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা তামাং। বাবলু চাপা গলায় বলল, "কী আশ্চর্য! আমরা তো জানি পাপটা কার্শিয়াঙে নেমে গেছে। কিন্তু আবার এখানে এল কী করে?"

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই কোনও মতলবে গা ঢাকা দিয়েছিল। তারপর সুযোগ বুঝে উঠেছে।"

প্রেমা বলল, "ও মুঝে দে দো। ভগবান তেরা ভালা করেগা দুবেজি! দে দো মুঝে। নেহি তো চকু চালানে পড়েগা।" বলেই অ্যাটাচিটাকে নেবার জন্যে হাত বাড়াল প্রেমা।

দুবেজি অ্যাটাচিটা বুকে জড়িয়ে বললেন, "নেহি। এ ম্যায় নেহি দুঙ্গা।"

প্রেমার হাতে তখন একটা স্প্রিং দেওয়া ছোরা চকচকিয়ে উঠেছে, "আবভি দে দে।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ম্যাজিক ঘটে গেল যেন। এক পাশের দরজার ফাঁক দিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লেন দুবেজি। বাবলুরা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল একটুর জন্য সাংঘাতিক একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে দুবেজি রক্ষা পেলেও পায়ে বেশ ভালরকম চোট পেয়েছেন।

প্রেমা তামাং দুবেজির কাণ্ড দেখে পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল একবার। তারপর ছোরাটা মুখে নিয়ে সেও লাফিয়ে পড়ল ট্রেন থেকে।

ভোম্বল বলল, "এ যে হিন্দি ছবির সুটিং দেখছি রে ভাই।"

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

বাবলু বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়। বেশ ভাল রকম মালকড়ি কিছু আছে নিশ্চয়ই অ্যাটাচিতে। তাই সেটার গন্ধ পেয়ে পিছু নিয়েছে ওঁর।"

বাবলুরা সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল দুবেজি অ্যাটাচিট হাতে নিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে খোড়াতে খোড়াতে ছুটছেন। আর ওর পিছনে বুলডগের মতো তাড়া করে চলেছে দুর্ধর্ষ প্রেমা তামাং।

দুবেজি চিৎকার করছেন, "বাঁচাও। মুঝে—বা—চা—ও।" কিন্তু কে বাঁচাবে তাকে? এই নির্জন অরণ্যে কেই বা আছে? ওরাও ছুটছে। ট্রেনও ছুটছে। ওদের ছোটা অবশ্য ট্রেনের গতির চেয়েও জোরে। একসময় ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এল।

ওরা দেখতে পেল প্রেমা তামাং বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল দুবেজির ওপর। দুবেজি প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওই অসুরের শক্তির কাছে তার শক্তি কতটুকু? এক ঝটকায় দুবেজির হাত থেকে অ্যাটাচিটা ছিনিয়ে নিল প্রেমা। তারপর দুবেজির চোয়াল লক্ষ্য করে সজোরে মারল এক ঘুষি।

দুবেজি টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়লেন কিছুটা দূরে। প্রেমার রাগ তবুও পড়ল না। সে ছুটে গিয়ে জামার কলার ধরে টেনে তুলল দুবেজিকে। তারপর সজোরে তলপেটে এমন একটা লাথি মারল যে দুবেজি আরও কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লেন।

টয় ট্রেন তখন থেমে গেছে। লাইন ক্লিয়ার না পেয়েই হোক বা অন্য যে কোনও কারণেই থেমে গেছে। একে তো পাঁচ বগির ট্রেন। তার ওপর লোকজনও খুব কম। ড্রাইভার গার্ড সবাই একদৃষ্টে হা করে তাকিয়ে মারপিট দেখছে। কিন্তু আশ্চর্য! বিপন্ন লোকটিকে উদ্ধার করবার জন্য কেউই এগিয়ে যাচ্ছে না।

বাবলুরা আর কালবিলম্ব না করে ঝুপঝাপ লাফিয়ে নামল ট্রেন থেকে। তারপর পঞ্চুকে লেলিয়ে দিয়েই হইহই করে ছুটল। ওদের সবার আগে ছুটল পঞ্চু। সে সেই বনভূমি কাঁপিয়ে এমন মারাত্মক রকমের ঘেউ ঘেউ করে উঠল যে আমন ভয়ংকর-দর্শন প্রেমা তামাংও শিউরে উঠল তখন।

এদিকে বাবলুদের ওইভাবে পঞ্চু সমেত এগোতে দেখেই চিৎকার করে উঠল প্রেমা, "হঠ যাও হিয়াসে। নেহি তো গোলি মার দুঙ্গা।"

প্রেমার এক হাতে অ্যাটাচি অন্য হাতে সেই ছোরাটা। পঞ্চুকে এগোতে দেখেই চোখের পলকে ছোরাটা সজোরে নিক্ষেপ করল পঞ্চুর দিকে। পঞ্চু লাটুর

মতো পাক খেয়ে ছোরার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করল। ছোরাটা বিদ্ধ হল একটা গাছের গুড়িতে।

ছোরা ফসকালেও প্রেমা নিরস্ত্র নয়। ওর হাতে ঝকঝকে চকচকে একটা রিভলভার দেখা গেল। রিভলভার দেখেই থমকে দাঁড়াল বাবলুরা। পঞ্চু কিন্তু ভয় পাবার পাত্রই নয়। সে আরও জোরে ভৌ ভৌ করে তেড়ে গেল। প্রেমা ভাবতেও পারেনি এমন বিপদের মধ্যে তাকে পড়তে হবে বলে। সে হঠাৎ হকচকিয়ে না পারল পালাতে, না পারল আক্রমণ প্রতিহত করতে, না পারল গুলি চালাতে। গুলি চালাতে না পারার একমাত্র কারণ সে বেশ কায়দা করে নেবে বলে অ্যাটাচিটাকেই ডান হাতে শক্ত করে ধরেছিল। ফলে বাঁ-হাতে ছোরা নিক্ষেপ করায় লক্ষ্যভেদ অব্যর্থ হয়নি এবং সাহস করে রিভলভারটাও চালাতে পারছে না। তবুও পঞ্চু যখন খুব কাছে এসে পড়ল তখন হাতের রিভলভার হাতেই রইল তার। আপাতত আত্মরক্ষার জন্য অ্যাটাচিটাই ছুড়ে মারল পঞ্চুকে। মেরেই রিভলভারটা হাত বদল করল।

পঞ্চু একবার কেউ করে উঠল। তারপর সজোরে লাফ দিল প্রেমার দিকে।

প্রেমা এক ঝটকায় দুবেজিকে সরিয়ে দিয়েই এক লাফে কিছুটা পিছিয়ে এসে পঞ্চুর দিকে রিভলভার তাগ করল। যেই না করা বাবলু অমনি সেই হাত লক্ষ্য করে একটা বড় সড় পাথর কুড়িয়ে ছুড়ে দিল। আর ঠিক তখনই হয়তো একেই বলে নিয়তি, দুবেজি ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রেমার হাতে। অসাবধানে ট্রিগারে চাপ পড়তেই একটা শুধু শব্দ হল গুড়ুম। দুবেজি আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন। পঞ্চুর বদলে বুলেট বিদ্ধ হল দুবেজির বুকে। দুবেজির বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে তখন। প্রেমার হাত থেকেও তখন রিভলভার খসে পড়েছে। রিভলভারটা খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চু সেটা মুখে নিয়ে পালিয়ে এল বাবলুর কাছে। বাবলু সেটা নিয়ে নিল।

সেই ফাঁকে অ্যাটাচিটা কুড়িয়ে নিতে গেল প্রেমা। কিন্তু পঞ্চু আবার তেড়ে যেতেই দৌড় লাগাল। খানিকটা ছুটেই পঞ্চুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একটা পাথর কুড়িয়ে ছুড়ে মারল পঞ্চুকে।

পঞ্চু এবারে আর নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। পাথরটা ওর মুখে লাগতেই কষ বেয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে লাগল। পঞ্চুও কেউ কেউ করতে লাগল যন্ত্রণায়।

বাবলু রিভলভারটা হাতে পেয়েও চোখের সামনে খুন দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রথমেই ছুটে এল দুবেজির কাছে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও এল। এমনকী সাহস পেয়ে টয় ট্রেনের অন্যান্য যাত্রী ও ড্রাইভার গার্ডও ছুটে এল এবার।

গুলিবিদ্ধ দুবেজি তখনও ছটফট করছেন। বাবলু বলল, "আপনারা এদিকটা দেখুন। দুবেজির মুখে একটু জল দেবার ব্যবস্থা করুন। আমি ওই শয়তানটাকে দেখছি।"

বাচ্চু ওদেরই ওয়াটার বটলটা নিয়ে এসে সেই জল একটু একটু করে খাইয়ে দিতে লাগল দুবেজিকে। আর বাবলু? সে রিভলভার উঁচিয়ে ধাওয়া করল প্রেমাকে। প্রেমা তখন অনেক দূরে চলে গেছে। বাবলুকে ছুটতে দেখে পঞ্চুও এবার নিজের কষ্টকে অগ্রাহ্য করে তাড়া করল প্রেমাকে।

প্রেমা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ওকে ধরবার জন্য বাবলুও ছুটছে প্রাণপণে। পঞ্চুও ছুটছে প্রায় ওদের দ্বিগুণ জোরে।

বাবলু ছুটতে ছুটতেই চেঁচিয়ে বলল, "এখনও বলছি যদি বাঁচতে চাও তো ধরা দাও। না হলে আমিই এবার গুলি চালাতে বাধ্য হব। তোমার রিভলভার আমার হাতে।"

প্রেমা থমকে দাঁড়িয়ে একবার ফিরে তাকাল। তারপর আবার ছুটল। বাবলু বলল, "আমার খপ্পর থেকে তুমি কিছুতেই পালাতে পারবে না প্রেমা তামাং।"

প্রেমা তখন নাগালের মধ্যে। বাবলু ওর পা লক্ষ্য করে গুলি চালাল। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে এক ঝলক আগুন ও ধোঁয়ার কুণ্ডলি সমেত বুলেটটা ছুটে গেল। কিন্তু না। ছুটন্ত অবস্থায় গুলি চালানোর জন্যই বোধ হয় ফসকে গেল তাগটা। তাই আবার ট্রিগারে চাপ দিল বাবলু। কিন্তু এবার আর কোনও শব্দই বেরোল না রিভলভার থেকে। অর্থাৎ এতে মাত্র দুটাে গুলিই ছিল। একটি দুবেজির জন্য এবং একটি ফসকানোর জন্য। তা হোক। বাবলু নিজেও তো নিরস্ত্র নয়। একটু সময় নষ্ট করে রিভলভারটা পকেটে রেখে নিজের পিস্তলটা বার করল।

ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রেমা ওদের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। আর পালাবার পথ নেই। পঞ্চুও তখন ওর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে।

বাবলু পিস্তলটা তাগ করতে যাবে এমন সময় দেখল প্রেমা তামাং হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে উলটোদিকে কোথায় যেন লাফিয়ে পড়ল। কোথায়? কোথায়? কোথায়? হতভাগাটা আত্মহত্যা করল নাকি? বাবলু ছুটে এসে দেখল বেশ কয়েক হাত নীচে রোড ট্রান্সপোর্টের একটি মাল বোঝাই লরির ওপর লাফিয়ে পড়েছে প্রেমা তামাং। লরিটা প্রেমাকে নিয়েই পাহাড়ের ফাঁকে হারিয়ে গেল। নিষ্ফল আক্রোশে পঞ্চু তখন চেঁচিয়েই চলেছে, "ভৌ ভৌ ভৌ ভোঁ ভৌ, ভোঁ—উ—উ—উ—উ।"

৩

ওরা আবার দুবেজির কাছে ফিরে এল। দুবেজির তখন প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। রক্তক্ষরণ হতে হতেই একসময় স্থির হয়ে গেল দেহটা।

বাবলু বলল, "যাঃ। সব শেষ।"

এই রকম একটা নাটক যে ঘটে যাবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। থেমে থাকা টয় ট্রেন থেকে অন্যান্য সহযাত্রীরা দলবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এল এবার। তারা সবাই দুবেজির মৃতদেহটা পাজাকোলা করে তুলে নিয়ে ট্রেনে ওঠাল। বাবলুদের সাহসেরও প্রশংসা করতে লাগল সকলে। সবাই বলল, "প্রেমা তামাং এই দার্জিলিং জেলাটারই একটি সন্ত্রাস। বছর খানেক আগে কোচবিহারে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে ও। তারপর থেকে ওর কোনও হদিস ছিল না। জেল পলাতক হয়ে অথবা জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ও আবার ফিরে আসছিল স্বস্থানে। কিন্তু চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী। এখানকার নাম করা জহুরি দুবেজিকে দেখেই মাথার গোলমাল হয়ে গেছে ওর।

দুবেজির অ্যাটাচিটা বাবলুর হাতে ছিল। বাবলু বলল, "এতে নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা-পয়সা আছে?"

সবাই বলল, "তা তো আছেই। সোনাদানাও থাকতে পারে।"

"কিন্তু এত টাকা-পয়সা সোনাদানা নিয়ে উনি এইভাবে ট্রেনেই বা যাচ্ছিলেন কেন? এত ঘন ঘন বাস রয়েছে যেখানে।"

"তা হলে আর নিয়তি কাকে বলে। তা ছাড়া আমাদের এখানে চুরি-ডাকাতিটা খুবই কম। বিশেষ করে প্রেমা তামাং না থাকায় খুবই শান্তিতে ছিল এখানকার লোকেরা। আবার কী হয় কে জানে?"

বিলু বলল, "দেখ বাবলু, আমার মনে হয় দুবেজি বাসে অথবা অন্য কিছুতে যেতেন। হঠাৎ এখানে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো প্রেমা তামাংকে আচমকা দেখেই ট্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, তাও হতে পারে। যাক। অ্যাটাচিটা দার্জিলিংয়ে নেমেই আমরা পুলিশের হাতে তুলে দেব।"

ট্রেন ছাড়ল। আবার সেই ছন্দে ছন্দে দুলে দুলে সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে হুইসিল বাজিয়ে ছুটে চলল ট্রেন। সোনাদার ভীষণ অরণ্যানী পেরোবার পর হঠাৎ সর্বাঙ্গে যেন কাঁপ দিয়ে উঠল। চারদিক মেঘাচ্ছন্ন। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। ট্রেনটা যেন অতিকষ্টে হাপিয়ে হাপিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ক্ষণে ক্ষণে মেঘ এসে চারদিক আরও ঢেকে দিতে লাগল।

একজন বলল, "ঘুম।"

বাবলুরা সবিস্ময়ে বলল, "এই সেই ঘুম!"

"হ্যাঁ, এই লাইনের সব চেয়ে উঁচু জায়গা।"

বাবলু বলল, "বইতে পড়েছি ঘুমের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ৭৪০৭ ফুট।"

ঘুমে ট্রেন থামতেই বাবলুরা যে যার গরম জামা পরে নিল। তারপর ট্রেন চলল দার্জিলিংয়ের দিকে। ঘুমের পরেই দার্জিলিং। ঘুম আর দার্জিলিংয়ের মাঝে রয়েছে সেই বিখ্যাত বাতাসিয়া লুপ। বাবলুরা দূর থেকেই পটে আঁকা ছবির মতো দার্জিলিং দেখতে পেল। ট্রেন এবার ৬০০ ফুটের মতো নীচে নামছে। বেলাও গড়িয়ে আসছে। কিন্তু এখনই ওদের হোটেলে ওঠা চলবে না। থানা-পুলিশের ব্যাপার আছে। প্রেমা তামাং সম্বন্ধে ওদের জবানবন্দি দিতে হবে।

যাই হোক, এক সময় দার্জিলিং এল। ট্রেনের লাইনও শেষ হল। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের পুলিশ এসে ছেকে ধরল ট্রেনটিকে। গার্ডসাহেব ঘুম স্টেশন থেকে ফোনে সব কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন দার্জিলিংকে। তাই পুলিশ

এবং নিহত দুবেজির বাড়ির লোকেরা সবাই এসে জড়ো হল। অ্যাটাচি এবং মৃতদেহ পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে পুলিশের গাড়িতে চেপেই থানায় গেল ওরা। তারপর সেখানে ওদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে প্রেমার রিভলভারটাও জমা দিল।

এখানকার পুলিশের সবাই প্রায় নেপালি। বাবলু তাদের অনুরোধ করল ওদেরকে হোটেল প্রিন্সে পৌছে দেবার জন্য। বাবলুদের অনুরোধ পুলিশ রাখল। ওদের যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে পুলিশের জিপ ওদের নিয়ে ম্যালের দিকে চলল ।

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে। ম্যাল রোড ধরে জিপটা ম্যালে উঠেই ডানদিকে পাহাড়ের ঢালে টার্ন নিল। এইখানে এক জায়গায় ঘোড়ার আস্তাবল রয়েছে একটি। তার পাশেই দু-একটি বাড়ি ছেড়ে এক মনোরম পরিবেশে হোটেল প্রিন্সে উঠল ওরা।

হোটেলের মালিক গজাননবাবু সমাজপতিবাবুর নাম শুনে এবং পুলিশের জিপে বাবলুদের আসতে দেখে পরম সমাদরে বাবলুদের আশ্রয় দিলেন। পাহাড়ের ঢালের গায়ে প্রশস্ত একটি ঘর বাবলুদের জন্য বরাদ্দ হল। পঞ্চুরও। গজাননবাবু একবার শুধু পঞ্চুকে দেখে বললেন, "কামড়ায় না তো?"

বাবলু বলল, "না না। ও খুব লক্ষ্মী।"

গজাননবাবু বললেন, "ঘর পছন্দ তোমাদের?"

সকলে বলল, "নিশ্চয়। আমরা তো এই রকম ঘরই চাইছিলাম। বেশ মনের মতো ঘর হয়েছে আমাদের।"

ওরা যে ঘরে ছিল সেই ঘরের পাশেই হাজার ফুট গভীর খাদ। একটি ভয়াবহ ঢাল ঘরের দেওয়ালের গা ঘেঁষে নীচে বহু নীচে নেমে গেছে। যদি একবার কোনওরকমে একটি ধস নামে তো এই ঘরসুদ্ধ সকলে কোথায় যে তলিয়ে যাবে তা কে জানে।

তবুও ঘরটা ভাল লাগল বাবলুদের। একজন এসে গরম জল দিয়ে গেল। তাইতে মুখ-হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিল ওরা। একটু পরেই চা-টোস্ট-কলা-ডিম

এল। তাই খেয়ে ওরা বড় খাটের ওপর পাতা বিছানায় গুছিয়ে বসল। আজ আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া নয়। রাতের খাবার খেয়েই তেড়ে ঘুম দেবে সকলে। তারপর কাল সকাল থেকেই শুরু হবে ভ্রমণ। চার পাঁচদিন ধরে আনন্দে উল্লাসে গোটা দার্জিলিংকে তোলপাড় করে ফেলবে ওরা।

রাত আটটার সময় মাংস আর রুটি এল। বাচ্চু, বিচ্ছু, ভোম্বল তখন ঘুমে ঢুলছে। বাবলু বিলুরও চোখে ঘুম নেমে আসছে তখন। প্রচণ্ড শীত রয়েছে এখানে। এবার শুলেই হয়। ওরা কোনওরকমে খাওয়ার পাট চুকিয়ে লেপ কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পঞ্চুও শুল তক্তপোশের নীচে পুরু কর্পেটে। এখানকার মেঝে সান বাঁধানো নয়। কাঠের তক্তা পাতা।

শোবার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

সকালে ঘুম যখন ভাঙল তখনও সূর্য ওঠেনি। প্রচণ্ড শীতে সারা শরীরে কাঁপ দিচ্ছে। ওরা বাথরুমের কলে মুখ-হাত ধুয়ে নিল। উঃ, কী দারুণ ঠান্ডা জল। যেন বরফ গলানো। ওদের উঠতে দেখেই গজাননবাবু এসে বললেন, "কী গো, কোনও অসুবিধে হয়নি তো তোমাদের?"

বাবলু বলল, "না।"

"বেশ বেশ। অসুবিধে হলে বলবে। কেমন?"

"নিশ্চয়ই বলব।"

"এবার তা হলে চা দিয়ে যেতে বলি?"

"হ্যাঁ, বলুন। চা খেয়েই আমরা বেড়াতে যাব।"

গজাননবাবু চলে যেতেই তক্তপোশের তলা থেকে পঞ্চু বেরিয়ে এসে একটু গা ঝাড়া দিয়ে নিল প্রথমে। তারপর তক্তপোশে উঠে ওদের লেপের তলায় বডিটা ঢুকিয়ে দিয়ে শুয়ে রইল চুপচাপ।

বাবলু কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা পাউরুটি বার করে খেতে দিল পঞ্চুকে। পঞ্চুর বোধ হয় খিদেও লেগেছিল খুব। তাই রুটিটা পাওয়া মাত্রই কাউ কাউ করে খেতে লাগল।

একটু পরেই বয় এসে চা-টোস্ট-ডিম-কলা ইত্যাদি দিয়ে গেল। বাবলুরাও সেগুলো ভাগাভাগি করে খেয়ে নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে পঞ্চু সমেত বেড়াতে চলল বাইরে।

বিলু বলল, "এখানে তো কনডাক্টেড ট্যুরে অনেক প্রাইভেট গাড়ি পাওয়া যায়। তাই একটা ভাড়া করে চারদিক দেখে নিই চল।"

বাবলু বলল, "না। ওভাবে নয়। আমরা যা ঘুরব তা পায়ে হেঁটেই। তাতেই ঘোরাটা ভাল হবে। দার্জিলিং ছোট্ট জায়গা। কাজেই মোটরে বসে চোখের পলকে সব কিছু সেরে নিতে চাই না।"

ভোম্বল বলল, "পায়ে হেঁটে কি করে ঘুরবি? ছোট্ট জায়গা হলেও এখানে কোথায় কী আছে সব তুই জানিস?"

"সব জানি। যদিও দার্জিলিংয়ে কখনও আসিনি তবুও দার্জিলিং সম্বন্ধে এত পড়াশোনা করেছি যে এর প্রতিটি নাড়ি-নক্ষত্র কোথায় কী আছে না আছে সব আমার মুখস্থ পথের মানচিত্রও আমার মনের মধ্যে কাল্পনিকভাবে আঁকা আছে। কাজেই এখানকার স্থানীয় লোককে জিজ্ঞেস করলেই আমাদের দর্শনীয় স্থানগুলোর হদিস পাওয়া যাবে। এই পাহাড়ি এলাকার কোনও দ্রষ্টব্য স্থানই দুতিন কিলোমিটারের বেশি নয়। শুধু টাইগার হিল ছাড়া। টাইগার হিলও আমরা হেঁটে যেতে পারি। তবে যাব না এই কারণে, যে সময় ঘুম থেকে উঠে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যেতে হয় সে সময় হাঁটতে পারব না।"

বাচ্চু বলল, "এখন তা হলে আমরা কোথায় চলেছি?"

"আমরা যাচ্ছি ম্যালের দিকে।"

"ম্যাল! ম্যাল আবার কী?"

"বলছি। আগে ম্যালে গিয়ে বসি চল!"

ওরা কথা বলতে বলতে সেই ঘোড়ার আস্তানাটার কাছে এসে গেল। সারি সারি ঘোড়া ট্যুরিস্টদের নিয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্য দাড়িয়ে আছে সেখানে।

একজন নেপালি সহিস ওদের দেখে এগিয়ে এসে বলল, "কী খোকাবাবুরা! ঘোড়ায় চাপবে না? মাত্র দুটাকায় রাউন্ড দিইয়ে আনব।"

বাবলু বলল, "চাপব। তবে এখন নয়। পরে।"

ওরা সেই কনকনে ঠান্ডায় ম্যালে এসে বেঞ্চিতে বসল। কী চমৎকার জায়গা। এখান থেকে চারদিকের দৃশ্য খুব ভালভাবে দেখা যায়। চারদিকে শুধু পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়।

বাবলু বলল, "এই হচ্ছে ম্যাল। এর পুরনো নাম চৌরাস্তা। শিলিগুড়ি থেকে রেলপথের গায়ে গায়ে যে মোটর চলা পাকা রাস্তাটা দেখলি ওই রাস্তাটার নাম হচ্ছে হিল কার্ট রোড। ওই দেখ। ওই রোড লেবং গ্রামে গিয়ে শেষ হয়েছে।"

"লেবং গ্রাম! লেবং রেসকোর্স যেখানে?"

"হ্যাঁ।"

"আর এই যে চৌরাস্তা, এর ওই পথটা এসেছে জলাপাহাড়ের দিক থেকে। এবং এই পথটার নাম লাডেনলা রোড। আগের নাম ছিল ম্যাকেঞ্জি রোড। এই সড়কটি হচ্ছে দার্জিলিংয়ের প্রধান রাজপথ।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু অবাক হয়ে দেখল। পঞ্চুও দেখছে। দেখে অভিভূত।

কী চমৎকার পরিবেশ। ম্যালের যে চৌরাস্তা তা কিন্তু চারটি পথের একত্র মিলনস্থান নয়। দূরত্ব বেশ কিছুটা। শহরের উচ্চস্থানে রেলিংঘেরা অনেকখানি প্রশস্ত স্থানের চারটি কোণ দিয়ে চারটি রাস্তা বেরিয়েছে বা মিলেছে। চারদিকে দোকানপাট। জলাপাহাড় ও ল্যাডেনলা রোডের বিপরীত দিকের যে পথ দুটি তার বাঁদিকের পথটি চলে গেছে বার্চ হিলের দিকে। আর ডানদিকের পথটি চলে

গেছে স্টেপ অ্যাসাইডে। ম্যাল থেকে মাত্র তিন মিনিট। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই স্টেপ অ্যাসাইডে দেহরক্ষা করেন।

বাবলু বলল, "আমাদের সামনেই যে পাহাড়ের চূড়াটা দেখা যাচ্ছে এর নাম অবজারভেটারি হিল।"

বিলু বলল, "সত্যি। কী সুন্দর। শহরের একেবারে মাঝ-মধ্যিখানে। উঠবি ওপরে?"

"নিশ্চয়ই। এখনই উঠব।"

ওরা স্থানীয় একজন ভুটিয়াকে পাহাড়ে ওঠবার পথ কোনদিকে তা জেনে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ম্যালের পাশেই ব্র্যাবোর্ন পার্ক। তার পাশ দিয়েই অবজারভেটারি হিল-এ ওঠার রাস্তা। হিলে ওঠার সে কী আনন্দ। পঞ্চু তো লাফিয়ে নেচে গড়াগড়ি খেয়ে ওদের আগে আগে চলতে লাগল। আর বাবলু ওর মাউথ অর্গানটা বার করে সুরের ঝরনা বইয়ে দিতে লাগল। প্রচলিত একটি গানের সুর। বড়ই সুমধুর। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সেই সুরের সঙ্গে কখনও কণ্ঠ দিতে লাগল। কখনও টুসকিতে তাল দিতে লাগল। শুধু বাবলুরা নয়। আরও অনেককেই পাহাড়ে উঠতে দেখা গেল। তাদের প্রত্যেকের হাতেই পূজার ডালি।

বিলু বলল, "ওপরে কোনও মন্দির আছে নাকি বল তো?"

বাবলু ধপ করে এক জায়গায় বসে পড়ে বলল, "হ্যাঁ। মন্দির আছে বইকী, মহাকালের।"

"মহাকাল!"

"হ্যাঁ। দুর্জয়লিঙ্গ মহাদেব। এই শিখরটির নামও দুর্জয়লিঙ্গ। আগে এই পাহাড়ে দোর্জেদের বাস ছিল। তাদেরই প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। দোর্জেদের প্রতিষ্ঠা করা শিবলিঙ্গের নামানুসারেই দোর্জেলিঙ, দুর্জয়লিঙ্গ বা সেই নামেরই অপভ্রংশ হিসাবে আজকের এই দার্জিলিং হয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "বেশ মজার ব্যাপার তো।"

বাবলু বলল, "এটা অবশ্য সাধারণে বলে। তবে ইতিহাস বলে তিব্বতি ভাষায় দোর্জে কথাটার মানে হচ্ছে বজ্র। আর লিং কথার মানে লিঙ্গ নয়, স্থান। অর্থাৎ কিনা বর্জ্রের দেশ। দার্জিলিং তো এমনিই মেঘমালার দেশ, কাজেই মেঘমালার দেশ বজ্রের দেশ হবে না কেন? তাই দোর্জেলিঙ থেকেই দার্জিলিং।

বাচ্চু বলল, "সত্যি বাবলুদা। তুমি কত জান।"

বিচ্ছু বলল, "চলো। আর বসে থেক না। ওঠ।"

বাবলু আবার মাউথ অর্গানে সুর বাজাতে বাজাতে চলল। যেতে যেতে হঠাৎ বাজনা থামিয়ে বলল, "বাঙালিরা কী বলে জানিস? বাঙালিরা বলে বহুকাল আগে এই পাহাড়ের মাথায় ছিল দুর্জয়লিঙ্গ নামে শিব। গোর্খরা যখন দার্জিলিং আক্রমণ করে তখন সেই শিবকে একটি গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়, এই শিবের নামেই জায়গাটার নাম দার্জিলিং। কিন্তু এখানকার লোকেরা বলে গত শতাব্দীতে এই পাহাড়ের ওপরে একটা গুম্ফা ছিল। সেই গুম্ফার লামা ছিলেন দোর্জে। দোর্জে লামার একটি সমাধি আজও আছে এখানে।"

বিলু বলল, "সেই গুম্ফাটা কি এখনও আছে?"

"বলতে পারব না। তবে শুনেছি গোর্খারা নাকি এটিকে ভেঙে দেয় এবং পরে ম্যালের নীচে ভুটিয়া বস্তিতে একটি নতুন গুম্ফা হয়।"

কথা বলতে বলতেই ওরা অবজারভেটারি হিলের ওপরে উঠল। এটা যেন দার্জিলিংয়ের মনুমেন্ট। এখান থেকে গোটা শহরটা এবং দূরের বহু দূরেরও পার্বত্য এলাকাগুলো দেখা যেতে লাগল। এক জায়গায় ছোট্ট একটা মন্দির মতো রয়েছে। সেখানে নানা রঙের নিশান উড়ছে বাঁশের ডগায়। পাহাড়িরা পুজো দিচ্ছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়াচ্ছে। এর একদিকে হনুমান ও কালীর স্থান ভারী মনোরম।

বাবলুরা সব দেখে শুনে নীচে নামতে লাগল এবার। বিলু বলল, "সত্যি, এই পাহাড়ের ওপরে এত যে ঘন বসতি, মানুষ এসবের সন্ধান পেল কী করে বল তো?"

বাবলু বলল, "সেও এক ইতিহাস। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে গোর্খা নামে একটি পার্বত্য জাতির অভ্যুত্থান হয়েছিল। পাঞ্জাব থেকে ভুটান পর্যন্ত হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে ছিল তাদের রাজত্ব। আর এই রাজ্যই হল নেপাল। এরা করত কী নিজেদের রাজ্য ছেড়ে যখন তখন ব্রিটিশ রাজ্যে ঢুকে বেধড়ক মারপিট ও লুটপাট করত। তাই ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস সাহেব গোর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ প্রথমে সুবিধে করতে পারেনি। তবে বছর দুই বাদে অবশ্য গোর্খরা সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে একদিকে কুমায়ুন ও গাড়োয়াল এবং অন্যদিকে নেপালের তরাই অঞ্চল ও সিকিমের ওপর থেকে তাদের অধিকার ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু তাতেও বিরোধের নিষ্পত্তি একেবারে হল না। সিকিম ও নেপাল সীমান্তে গোলমাল লেগেই থাকত। তাই দেখে ক্যাপ্টেন লয়েড এলেন বিবাদ মেটাতে। এই অঞ্চলটি তার খুব ভাল লাগল বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি চাইলেন। তারপর সিকিমের মহারাজার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন জেলাটি। ১৮৩৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল। এরপর ক্যাপ্টেন লয়েড ও ডক্টর চ্যাপম্যান এসেছিলেন দার্জিলিংয়ের অধিকার নিতে। এরও চার বছর পরে ডক্টর ক্যাম্পবেল এলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে। তিনি একটানা বাইশ বছর এখানে কাটান। তারই অক্লান্ত পরিশ্রমে শহরটি গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে।

কথা বলতে বলতেই বাবলুরা নীচে নামতে লাগল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু বাবলুর এই জ্ঞানভাণ্ডারকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারল না। সত্যি, বাবলু কত কী জানে। কত পড়াশুনো ওর।

পঞ্চু ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যাপারটা না বুঝলেও মাটি ও পাথরের ঘ্রাণ নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে লেজ নেড়ে নেড়ে এই অনাবিল সৌন্দর্যকে উপভোগ করে তার আনন্দের প্রকাশ ঘটাতে ছাড়ল না।

এমন সময় হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে যার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাকে এখানে দেখবে বলে ওরা কেউ আশাও করেনি। এমনকী তার কথা মনেও ছিল না ওদের। তাই আনন্দের আবেগে চেঁচিয়ে উঠল বাবলু, "এ কী রূপলাল!"

রূপলালও বিস্মিত। অভিভূত। বলল, "খোকাবাবুরা! তোমরা এখানে?"

"আমরা বেড়াতে এসেছি।"

"কই, তোমাদের আসার কথা আমাকে বলোনি তো?"

"হঠাৎই এলাম। তা যাক। তোমার মেয়ে কেমন আছে?"

"ভাল আছে বাবু! বিলকুল সেরে উঠেছে, তাই তো পুজো দিতে যাচ্ছি।"

"যাক ভালই হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছে তা হলে।"

"আমি দশদিন আগে চিঠি পেয়েছিলাম খোকাবাবু! ওর বুকে সর্দি জমে গিয়েছিল। ডাক্তার ভেবেছিল নিউমোনিয়া। তা যাক। আমার পড়শিরা এখানকার হাসপাতালে আমার মেয়েকে নিয়ে গিয়ে সুই দিইয়ে আনাতে মেয়ের বুখার সর্দি সব ভাল হয়ে গেছে। আমি এখানে এসে দেখি আমার মেয়ে অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে খেলা করছে। স্কুল যাচ্ছে।"

"যাক। খুব ভাল কথা। তা পুজো দিতে এলে যখন মেয়েকে নিয়ে এলে না কেন?"

"ও আসছে খোকাবাবু! ওর মায়ের সঙ্গে।" বলেই হাক দিল রূপলাল, "কমলা! এ কমলা! কমলি-হো—"

একটু পরেই দেখা গেল রূপলালের বউ কমলা ওদের আদরের মেয়ে সোনারুর হাত ধরে ওপরে উঠে আসছে। রূপলাল বলল, "সোনারু ! এরা হচ্ছে তোমার দাদা ও বহিন। মোলাকাত করো।"

রূপলাল বলল, "এ ওহি লেড়কা কলকাত্তাকা। যো হামকো রুপিয়া দিয়া থা।"

কমলা ছুটে এসে বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "মেরা বেটা। মেরে লাল। তুম সব বহৎ আচ্ছা লেড়কা-লেড়কি হো।"

বাচ্চু-বিচ্ছুও অভিভূত হয়ে ওদেরই সমবয়সি সোনারুকে জড়িয়ে ধরল। কী সুন্দর মেয়ে! কী স্বাস্থ্য! কী রং! আর কী অপূর্ব মুখশ্রী! যেন তাজা গোলাপ ফুল একটি।

বাবলু স্নেহপূর্ণ গলায় বলল, "তোমার নাম সোনারু?"

"তোমার ফটো আমরা দেখেছি। তুমি অসুস্থ ছিলে। এখন ভাল হয়ে উঠেছ দেখে খুব খুশি হয়েছি।"

সোনারু বলল, "আপনারা খুব ভাল। আপনাদের জন্যে আমি আমার বাবাকে অনেক দিনের পর দেখতে পাচ্ছি।"

বাবলু হেসে বলল, "বাঃ! তুমি বেশ ভাল বাংলা বলতে পারো তো।"

"এখানকার সবাই পারে। আমার বন্ধুরাও সব বাঙালি।"

কমলা বলল, "খোকাবাবু, তোমরা আমাদের বস্তিতে একবার বেড়াতে এসো। আমাদের কুড়েঘরে একটু চা খেয়ে যাবে।"

রূপলাল বলল, "হ্যাঁ। এক দো ঘণ্টেকে বাদ তোমরা আমাদের বস্তিতে এসো। আমরা ততক্ষণ পুজোটা দিয়ে আসি। তোমাদের ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না খোকাবাবু। আর হ্যাঁ। একটা সুখবর আছে। আমি এখানেই হ্যাপি ভ্যালি টি গার্ডেনে সামনের মাহিনা থেকে একটা নোকরি পেয়ে যাচ্ছি। তাই ভাবছি খোকাবাবু দেশ ছেড়ে আর অতদূরে কাজ কাম করতে যাব না। এখানকার নোকরিটা নিলে সব সময় আমি আমার লেড়কির কাছে থাকতে পারব।"

বাবলু বলল, "এ তো খুবই ভাল কথা। আমরা দুপুরবেলা যাব তোমাদের বস্তিতে। এখন আসি?"

"হ্যাঁ এসো।"

বাবলুরা আস্তে আস্তে নেমে এল হিল থেকে। ওদের নেমে আসা পথের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল সোনারু। গভীর প্রশান্তিতে ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি যেন ভরে গেছে।

দুপুরবেলা বাবলুরা খাওয়া-দাওয়ার পর সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়ে ভুটিয়া বস্তিতে বেড়াতে গেল। সোনারু অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। বাবলুরা যেতেই খুশিতে উপচে পড়ল সে। বাবলুদের সঙ্গে পঞ্চুকে দেখে তো আনন্দের অবধি রইল না তার। বলল "ও মা ! কুকুরটাকেও সঙ্গে এনেছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "এ কি যা তা কুকুর। একে আমরা এমনভাবে তৈরি করে নিয়েছি যাতে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চেয়েও কোনও অংশে কম যায় না এ।"

"বলো কী!"

"হ্যাঁ।"

বাবলুদের দেখে শুধু সোনারু নয়, রূপলাল ও তার বউ কমলাও কম খুশি নয়। কমলা বলল, "আমার তো কোনও লেড়কা নেই। তোমরাই আমার লেড়কা। তোমরা সবাই বসো। আমি তোমাদের জন্য কিছু খানা বানাই।"

বাবলু বলল, "না না। এখন কিছু বানাবেন না। আমরা এই সবে খেয়ে আসছি।"

তারপর সোনারুকে বলল, "তুমি তো এখন সেরে উঠেছ। দার্জিলিংয়ের কোথায় কী আছে তার সবই তোমার জানা। তুমি নিজে আমাদের একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে? অবশ্য যদি তোমার কষ্ট না হয়।"

সোনারু আগ্রহের সঙ্গে বলল, "না না কষ্ট হবে কেন? আমি তোমাদের সব কিছু দেখিয়ে শুনিয়ে দেব। তবে আজকের দিনটা তোমরা একটু বিশ্রাম নাও। কাল সকাল থেকে দেখাব।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। কাল থেকেই আমাদের ঘোরা শুরু হোক। আজ তো অবজারভেটারি হিল দেখলাম। কাল সোনারু গাইডকে নিয়ে দার্জিলিং চষে ফেলা যাবে।"

সোনারু বলল, "হ্যাঁ। কাল খুব ভোরে উঠে তোমরা টাইগার হিল দেখে এসো। ওখানে সূর্যোদয় দেখে ফিরে এলে বেলায় অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাব আমি।"

ভোম্বল বলল, "খুব ভোরে মানে কখন?"

"খুব ভোরে মানে খু-উ-ব ভোরে। অন্ধকার থাকতে। আজ একটা ল্যান্ডরোভারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে দেব। সেই তোমাদের হোটেলে গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমরা তো তোমাকে বাদ দিয়ে কোথাও যাব না সোনারু। দার্জিলিংয়ে আমরা যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ তুমিও থাকবে আমাদের সঙ্গে।"

সোনারু একটু কুণ্ঠিত গলায় বলল, "আমার ল্যান্ডরোভারের ভাড়া কে দেবে? এক একজনের বারো টাকা করে ভাড়া লাগে। আমি তো দিতে পারব না।"

বাবলু বলল, "তোমার ভাড়া তো আমরা দেব। তুমি আমাদের ল্যান্ডরোভারের ব্যবস্থা করে দাও।"

রূপলাল বলল, "সোনারু বিটিয়া। তু গোপালকা পাশ চলা যা। উয়ো সব বন্দোবস্ত কর দে গা।"

সোনারু বলল, "তবে চলো। এখনই নিয়ে যাই।"

ওরা বেরোতে যাবে এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে শেরপা গোছের একজন দানবাকৃতি লোক এসে দরজার সামনে দাঁড়াল।

তাকে দেখা মাত্রই দারুণ আতঙ্কে কীরকম যেন হয়ে গেল রূপলালের মুখখানা। কমলা ও সোনারুর মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গেল ভয়ে। শেরপাটি এসে গম্ভীর মুখে এক নজর তাকিয়ে দেখল সকলকে। তারপর কঠিন গলায় বলল, "হামারা গুরু ফিন আ গিয়া রূপলাল। তেরা বিটিকা কসম পঁচাশ রুপিয়া দে দে।"

রূপলাল ভয়ে ভয়ে বলল, "বিটিকা বেমারিমে বহৎ রুপাইয়া নিকাল গিয়া মংপু ইতনে রুপাইয়া কাহা সে মিলে গা?"

"হম ক্যা জানে? গুরু কা সেবা মে পঁচাশ নেহি তো পঁচ্চিশ রুপিয়া দে দো।"

"কুছ নেহি মেরে পাশ।"

মংপু এবার রূপলালের জামার কলারটা শক্ত করে ধরে একটু কাছে টেনে এনে বলল, "রুপিয়া নেহি দেওগে তো তুমহারা মুন্নিকো লে যায়েঙ্গে হাম!"

কমলা ও রূপলাল সোনারুকে বুকে জড়িয়ে ধরল, "নেহি। মাৎ লে যাও সোনারুকো।"

মংপু আর কোনও কথা না বলে এক ঝটকায় সোনারুকে ওদের দু'জনের বুক থেকে জোর করেই ছিনিয়ে নিয়ে কাধে ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রূপলাল ও কমলা চিৎকার করে উঠল, "কোঈ হ্যায়! রোখো রোখো এ বদমাশ কো। হামারা লেড়কি লেকে ভাগতা হ্যায়।"

কিন্তু কে রুখবে মংপুকে? ও তো মানুষ নয়। ছোটখাটো একটি দানব। অমন ভুটিয়া বস্তির কুঁদো কুঁদো লোকগুলোও ওর ভয়ে ভেড়ার মতো দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। একটি লোকেরও সাহস হল না তাকে বাধা দেবার।

ওদিকে মংপুর কাঁধ থেকে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে চিৎকার করতে লাগল সোনারু, "বাঁচাও ! মুঝে বাঁচাও !"

বাবলুরাও সবাই তখন ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। বাবলু সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে যখন দেখল মংপুকে বাধা দেবার মতো সাহস বা আগ্রহ কারও নেই তখন সে নিজেই ক্রোধে ফেটে পড়ে চিৎকার করে উঠল, "এই শয়তান, মংপু। শিগগির নামিয়ে দে সোনারুকে। নামা বলছি।"

জীবনে এই প্রথম বুঝি অন্যের বাধা পেল মংপু। তাও আবার একটি অল্পবয়সি ছেলের কাছে। অত লোকের সামনে একটি ছেলে তাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলবে আর সে মুখ বুজে সহ্য করবে তা কি হয়? তাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকাল। তারপর সোনারুকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে কোমরের বেল্টের সঙ্গে জড়ানো চেনটা খুলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে।

তাই দেখে রূপলাল ছুটে গেল মংপুর কাছে, "নেহি ও নাদান হ্যায়। ছোড় দো উসকো। মারো তো হামকো মারো।"

মংপু সে কথায় কান না দিয়ে এক ঝটকায় রূপলালকে ছিটকে ফেলে শিকারি বাঘের মতো এক পা এক পা করে এগোতে লাগল বাবলুর দিকে।

বাবলুও একটু একটু করে পিছোতে লাগল আর চাপা গলায় ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু কোনওরকম সাড়া শব্দ না দিয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল মংপুর দিকে। ক্রমে বাবলু আর মংপুর মাঝে পঞ্চু এসে দাঁড়াল। পঞ্চুর চোখদুটো তখন নেকড়ের মতো জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎই খুব ভয় পেয়ে গেল মংপু। তার মনে হল সে যেন একটি বাঘের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তাই হঠাৎ তার চলার গতি থেমে গেল। কিন্তু মংপু থামলেও পঞ্চু থামল না। নাটক দারুণ জমে উঠল। এবার মংপু একটু একটু করে পিছোতে লাগল।

আর পঞ্চু এগোতে লাগল। মংপু যত পিছোয় পঞ্চু তত এগোয়। সেই সঙ্গে বাবলুও।

পঞ্চু যে কী সাংঘাতিক রকমের রাগতে পারে তা এই প্রথম অনুভব করল বাবলু। মুখে কোনও সাড়াশব্দ নেই। কোনও তর্জন গর্জন নেই। শুধু ভয়ংকর রকমের চোখের চাউনিতেই ওই রকম একটি ধেঁড়েল শয়তানের বুক শুকিয়ে দিল।

মংপু পিছোতে পিছোতে একটা পাথরের দেওয়ালে গিয়ে আটকে গেল। আর পিছোবার উপায় নেই। এবার সামনে এগোতে হবে নয়তো ছুটে পালাতে হবে। কিন্তু তা কী সম্ভব! এই চতুষ্পদ জন্তুটি যে ওর সঙ্গে শেষ মোকাবিলা করবার জন্যে রুখে দাঁড়িয়েছে। অসহায় মংপু আত্মরক্ষার কোনওরকম উপায় না দেখে শেষ অস্ত্র হিসাবে সেই চেনটি ঘুরিয়ে যেই না মারতে যাবে পঞ্চুকে, পঞ্চু অমনই এক বীভৎস গলায় আঁ-উ-উ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মংপুর ওপর।

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে পঞ্চু মংপুর গলার টুটিটাকে কামড়ে ধরল। উঃ সে কী প্রচণ্ড কামড়! মংপুর হাত থেকে চেনটা খসে পড়ল। সে দুহাতে পঞ্চকে শক্ত করে ধরে টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করল। ওর দু' চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে তখন। সারা দেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মংপুর পা'দুটো বেঁকে গেল। যন্ত্রণায় একটুও আর্তনাদ করতে পারল না। অসহ্য যন্ত্রণায় দুমড়ে-মুচড়ে-কুঁকড়ে দেহটা পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর দু-একবার অসহায়ভাবে হাত-পা ছোঁড়ার পর স্থির হয়ে গেল দেহটা।

পঞ্চু তখনও ছাড়েনি। টুটি কামড়ে ধরে আছে।

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!" পঞ্চুর সাড়া নেই। শব্দ নেই। চোখদুটো ওর লাল। সারা দেহ শক্ত। কী হল পঞ্চুর? পঞ্চু! ততক্ষণে পুলিশ এসে গেছে। নেপালি পুলিশ। কিন্তু পঞ্চুর কী হল? সে এখনও ছাড়ছে না কেন? অবশেষে সবাই মিলে

অনেক জোরাজোরি করে অনেকক্ষণ টানা হেঁচড়ার পর ছাড়াল পঞ্চুকে। রাগে ওর সর্বশরীর তখনও কাঁপছে।

বাবলু বলল, "জল। একটু জল দাও পঞ্চুকে।"

বিলু আর ভোম্বল ছুটে গেল রূপলালের ঘরে। তারপর এক বালতি জল এনে পঞ্চুর সামনে ধরল। পঞ্চু চোঁ চোঁ করে অনেকটা জল খেয়ে রূপলালের ঘরের সামনে শুয়ে হাঁপাতে লাগল।

কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল তা ভেবেও পেল না কেউ। পুলিশ স্থানীয় লোকেদের কাছে থেকে রিপোর্ট চেয়ে নিল। বলল, "বহুত বঢ়িয়া শয়তান কো নিধন হো গিয়া।"

তারপর বাবলুদের বলল, "তোমরা দুদিনে দুটো খুব ভাল কাজ করেছ খোকাবাবু কাল তোমাদের জন্য অনেকগুলো টাকা ছিনতাই হতে হতে বেঁচে গেছে। আর আজ তোমাদেরই জন্য এই কুখ্যাত গুন্ডাটা মরেছে।"

বাবলু বলল, "আমাদের জন্য হলেও একে মারার কৃতিত্ব কিন্তু আমাদের এই পঞ্চুর ও না থাকলে হয় সোনারু না হলে আমাকে দুজনের একজনকে মরতেই হত আজ।"

পুলিশ বলল, "ঠিক আছে। তোমরা একটু সাবধানে থাকবে। তোমরা যে হোটেলে উঠেছ ওখানেও আমরা পুলিশ পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" এই বলে মংপুর ডেড বডি নিয়ে চলে গেল ওরা।

গোটা ভুটিয়া বস্তির লোক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, "ওঃ খোকাবাবু, তোমাদের কুকুরের তুলনা নেই। এই শয়তানরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ওপর খুব অত্যাচার করছিল।"

বাবলু বলল, "শয়তানরা মানে? এরা ক'জন?"

"অন্তত তিন চারজন।"

"এদের লিডার কে? জানো?"

"জানি। সে একটা পাক্কা শয়তান। কে না জানে তাকে?"

"বলো না রূপলাল ভাই তার নামটা?"

রূপলাল বলল, "ওর নাম প্রেমা তামাং।"

"প্রেমা তামাং!"

"হ্যাঁ, সে এতদিন জেলে ছিল। কালই শুনলুম এই অঞ্চলে তাকে আবার দেখা গেছে। তাই আজই ওর চর এসেছে ওর হয়ে তোলা আদায় করতে।"

বাবলু বলল, "প্রেমা কোথায় থাকে জানো?"

রূপলাল বলল, "তা হলে তো ঝামেলা চুকেই যেত। ওর নির্দিষ্ট কোনও ঘাঁটি নেই। মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মতো আসে আর উধাও হয়ে যায়। পুলিশও ভয় পায় ওকে। ছোট বড় ব্যবসাদাররা মাসে মাসে ওকে টাকা দেয়।"

"না দিলে?"

"আগুন জ্বালিয়ে দেবে। পাথর ছুড়ে মারবে। ছুরি মারবে।"

বাবলুরা অবাক হয়ে সব শুনল।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেল।

কমলা বলল, "এবার আমি কিছু খানা বানাই। তোমরা খাও। এতক্ষণে ভুখ লেগে গেছে নিশ্চয়ই?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। খেয়ে-দেয়ে আমরা বেরোব।"

রূপলালের বাড়িতে বেশ করে জলযোগ সেরে বাবলুরা চলল ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে। কাল খুব ভোরে বেরোতে হবে তো। টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখতে হবে।"

যাবার সময় বাবলু রূপলালকে বলল, "তা হলে আমরা চলি? আর সোনারু কিন্তু আজ আমাদের কাছেই হোটেলে থাকবে। না হলে কাল ভোরে যাওয়ার অসুবিধা খুব।"

রূপলাল বলল, "বেশ তো। তোমাদের বোন তোমাদের কাছে থাকবে। এতে আমার কী বলার আছে?"

রূপলালের অনুমতি পেয়ে বেশ খুশির সঙ্গেই সোনারু তৈরি হয়ে বাবলুদের সঙ্গে চলল। রূপলালের বউ কমলা মুগ্ধ চোখে এই দুঃসাহসী ছেলে-মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

বাবলুরা আগে আগে চলল। পঞ্চু পিছনে। ওর সারা মুখে এখনও রক্তের দাগ। মংপুকে হত্যা করে পঞ্চু যেন কী রকম হয়ে গেছে।

৪

ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে একটা ল্যান্ডরোভারের সঙ্গে কনট্রাক্ট করে বাবলুরা যখন হোটেলে ফিরল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ওরা যেতেই গজাননবাবু সহাস্যে বললেন, "এইমাত্র পুলিশ এসে ঘুরে গেছে। তোমরা এখনও আসনি দেখে চলে গেল। একটু পরেই আবার আসবে। তোমরা পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে ক'দিন আমার হোটেলে থাকবে আমি বিনা পয়সায় এখানে পুলিশ পাহারা পাব।"

বাবলু বলল, "আমরা যে পাণ্ডব গোয়েন্দা তা আপনি জানলেন কী করে?"

"কী করে জানলুম? কাল তোমরা টয় ট্রেনে কী কাণ্ড করেছিলে বাবা? তোমরাই তো পুলিশকে তোমাদের পরিচয় দিয়েছিলে কাল। তা ছাড়া তোমাদের খবর শিলিগুড়ি সেন্টার থেকে একটু আগেই প্রচারিত হয়েছে। আজও তোমরা একজন দুর্ধর্ষ শয়তানকে খতম করে দিয়েছ।"

বাবলু বলল, "আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি।"

"শুধু আমি কেন, দার্জিলিং শহরের সব লোকই এখন তোমাদের খবর জেনে গেছে।"

বাবলু বলল, "তা জানুক। তবে আজ রাত্রে আমাদের অতিথি হিসাবে রূপলাল ভুটিয়ার মেয়ে সোনারু থাকছে। আজ আমরা মাংস-ভাত খাব, ওর জন্যও এক্সট্রা একটা প্লেট পাঠাবেন।"

গজাননবাবু বললেন, "ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওসবের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোমরা এখন ঘরে যাও। আমি এখনই তোমাদের জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

এই রকম পরিবেশে এসে সোনারু তো দারুণ খুশি। কেন না এতবড় একটা হোটেলে এই বিলাসবহুল ব্যবস্থাপনার মধ্যে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শোবার

কথা, এই জল-কল-বাথরুম ইত্যাদি ব্যবহার করবার কথা বা হোটেলের ভাল-মন্দ খাবার কথা ওর জীবনে ও কল্পনাও করেনি কোনওদিন।

বাবলুরাও সোনারুকে পেয়ে খুব খুশি।

ঘরে ঢুকে সোনারুকে ঘিরে গোল হয়ে বসল সকলে। সোনারুর মুখে দার্জিলিংয়ের টাইগার হিলের অনেক গল্প শুনতে লাগল ওরা।

একটু পরেই জলখাবার এল। ওই একই ব্যবস্থা। টেস্ট, কলা, ডিম, চা।

ওরা জলযোগ সেরে প্রথমেই রাতের শোবার ব্যবস্থাটা ঠিক করে নিল। বাবলু, বিলু, ভোম্বল এক দিকে এবং বাচ্চু-বিচ্ছু ও সোনারু আর একদিকে। পঞ্চু যেমন খাটের নীচে থাকে তেমনই রইল।

রাত নটা নাগাদ খাবার ডাক পড়ল ওদের।

গরম গরম মাংসভাত খেয়ে ওরা এসে শয্যাগ্রহণ করল।

সোনারু বলল, "এই প্রথম আমি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকছি। মা বাবার জন্য খুব মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। বিশেষ করে মাকে ছেড়ে তো এক রাতও থাকিনি কখনও। বাবা অবশ্য চাকরি করতে গেলে বাবাকে ছেড়ে থাকতাম। তবে বাবার জন্য রোজ রাত্তিরবেলা আমার মন কেমন করত।"

বাবলু বলল, "সে কী! আমরা কিন্তু বাবা-মাকে ছেড়ে প্রায়ই এদিক ওদিক যাই। যেমন দার্জিলিংয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।"

সোনারু বলল, "তোমরা খুব ভাল। তোমাদেরকে খুব ভাল লেগেছে আমার তোমরা বলেই আমি এলাম। না হলে আসতাম না।"

বাবলু বলল, "তুমি তা হলে সত্যিই আমাদেরকে ভালবেসে ফেলেছ?"

"তা ফেলেছি। আমার তো দাদা নেই। বোনও নেই। তোমারই এখন সব। তোমরা কত উপকার করেছ আমাদের। আমার বাবাকে আমার কাছে এনে দিয়েছ। তা ছাড়া আজ তোমরা না থাকলে ওই শয়তান মংপুটা আমাকে কোথায়

নিয়ে যেত কে জানে? হয়তো মেরেই ফেলত। মা-বাবা কাউকেই আর আমি দেখতে পেতাম না।"

এইরকম কথা বলতে বলতেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

তখন শেষ রাত।

বাইরে থেকে কে যেন ডাকল, "সোনারু! এ সোনারু! গাড়ি রেডি। দোশো পাঁচ নম্বরক গাড়ি।"

সোনারু উঠে ডাকল সকলকে, "এই ওঠো, ওঠে সব। টাইগার হিল দেখতে যাবে যে?"

বাবলুরা সবাই উঠে পড়ল। ঘড়িতে দেখল তিনটে দশ।

"এখনই?"

"হ্যাঁ। এখনই গোপাল ডেকে গেল এইমাত্র।"

ওরা চোখের পলকে তৈরি হয়ে নিল। শুধু ওরা নয়, দার্জিলিং শহরের সমস্ত ট্যুরিস্টই উঠে পড়েছে তখন। চারদিকে সাজ সাজ রব। রোজই এই সময় দার্জিলিং জেগে ওঠে। অথচ কী প্রচণ্ড ঠান্ডা। হাত-পা সব যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

বাবলু বলল, "বাবাঃ! এত ঠান্ডা তো ছিল না। হঠাৎ এ কী!"

আর এ কী। ওরা তৈরি হয়ে ঘরে চাবি দিয়ে টর্চের আলোয় পথ দেখে বাইরে এল।

ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে ট্যাক্সি ও ল্যান্ডরোভারগুলি তখন যাত্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে এক এক করে ছাড়ছে।

ওদের দেখতে পেয়েই গোপাল ছুটে এল। গোপাল একটি সুদর্শন নেপালি কিশোর। ক্লিনারের কাজ করে। বাবলুদের জায়গা রাখাই ছিল। সোনারু সমেত প্রত্যেককে বসিয়ে নিল ওদের ল্যান্ডরোভারে। পঞ্চুর কথাও বলা ছিল। কাজেই

পঞ্চুকে দেখে কোনও আপত্তি করল না। ওরা সবাই বসলে পঞ্চু ভেম্বলের কোলে শুয়ে বিলুর কোলে মাথা রাখল।

এ বেশ মজার ব্যাপার।

শেষ রাতের অন্ধকারে সারি সারি জিপ-ট্যাক্সি ও ল্যান্ডরোভার লাইন দিয়ে চলেছে টাইগার হিলের পথে। দার্জিলিং থেকে প্রথমেই ঘুম। তারপর আরও একটু উচ্চস্থানে টাইগার হিলে গিয়ে যখন পৌছল তখন শীতের প্রচণ্ড দাপটে ওরা হিম হয়ে গেছে। পাথরে, ঘাসের ওপর, গাছের পাতায় গুড়ো গুড়ো বরফ পড়ে আছে।

সোনারু বলল, "ঠান্ডাটা আজ হঠাৎই খুব বেশি রকম পড়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু এই ঠান্ডাতেও আমাদেরও আগে আরও কত লোক এসে হাজির হয়েছে দেখো।"

ওরা দেখল প্রায় হাজারখানেক লোক এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। আর কত যে ট্যাক্সি জিপ ও ল্যান্ডরোভার জড়ো হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। সত্যি, কী চমৎকার জায়গা।

পুবের আকাশে একটু একটু করে রঙের খেলা শুরু হচ্ছে তখন। বাবলুরা দেখল কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার চূড়ায় সেই নয়ন মনোহর আলোর নাচন।

সোনারু বলল, "তিব্বতিরা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কী বলে জান তো? বলে কাং-চেন-জোঙ্গা।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। কাং মানে বরফ। চেন মানে বৃহৎ। আর জোঙ্গা মানে পাঁচ ধন ভাণ্ডার।"

বাবলু বলল, "বইতে পড়েছি কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ২৮১৫৬ ফুট।"

সোনারু বলল, "শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়। এর আশপাশেও যে সব গিরিশৃঙ্গগুলি আছে সেগুলোও কোনওটি ২০ হাজার ফুটের কম নয়।"

বাবলু বলল, "ওগুলোর নাম জান?"

"নিশ্চয়ই। পশ্চিমের ওই পাহাড়গুলো দেখো। ওইটার নাম কাঙ। ওই হল কেকটাঙ। ওই হচ্ছে জানু, কাবু। জানুর উচ্চতা ২৫ হাজার ফুটেরও বেশি। কাবু ২৪ হাজার ফুট। ওই দেখ জেম। ওটা একটু নিচু। ওর উচ্চতা কম।"

বাবলুরা অবাক হয়ে দেখল।

সোনারু বলল, "আর এদিকে এই যে দেখছ পাহাড়গুলো, যার মাঝে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ওর বাঁদিকে হল তালুঙ। উচ্চতা ২৩০০০ ফুট। ডানদিকে পন্দিম। উচ্চতা ২২০০০ ফুট। আর পুবের এই পাহাড়গুলো হল জুগনু, নরসিং, সিন্তু, সিনিয়লচু, চেমিয়াসো, কাঞ্চনজমাও, ডজ্বিয়ারি।"

বাবলু বলল, "ব্যস ব্যস। এবার থামো তুমি। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে হয়তো বেশি জানতে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার নামটাও ভুলে যাব।"

বাবলুরা কাঞ্চনজঙ্ঘায় সোনারোদের ছটা আর তার নীচেই উর্মিমালার মতো পুঞ্জিভূত মেঘসমুদ্র দেখতে লাগল। সে কী অপূর্ব দৃশ্য! দুরে—বহুদূরে—অনন্ত তুষারমণ্ডিত গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরিশৃঙ্গে প্রভাত অরুণরাগের ইন্দ্রধনুর সাতটি রং আবির ছড়িয়ে খেলা করছে। আর তারই নীচে কঠিন বরফের মতো জমাট বাধা মেঘস্তর স্থির হয়ে আছে। রঙের খেলায় চক্রবালব্যাপী তুহিনরেখাকে উল্লসিত করে সূর্যোদয় হল। বাবলুরা মুগ্ধ। বিস্মিত। বিমূঢ়। আনন্দে হইহই করে উঠল সকলে। ক্যামেরার পর ক্যামেরা ঝিলিক মেরে উঠল। দেখা শেষ।

এবার ফেরার পালা।

টাইগার হিল থেকে ফেরার পথে ঘুম মনাস্টারি দেখল। তারপর এল বাতাসিয়া লুপে। তখন পুরোপুরি সকাল হয়ে গেছে। তবে আকাশ বড় গম্ভীর। মেঘ মেঘ আকাশ। একটুও রোদ নেই। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে।

বাতাসিয়া লুপে তখন দার্জিলিং থেকে ছেড়ে নিউ জলপাইগুড়ির দিকে একটি টয় ট্রেন আসছে। তাই দেখারই কী ধুম। পঞ্চু তো মনের আনন্দে বাতাসিয়ার মাঠময় ছুটাছুটি শুরু করে দিল। কী চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানকার। একটু পরেই লুপ বা রেলচক্রে পাক খেয়ে টয় ট্রেন উঠে এল ওপরে।

যেই না ওঠা বাবলু বিলু ও সোনারু ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল ট্রেনে। তারপর ট্রেনটা আবার যখন ঘুরে অন্য চক্রে পড়ল ওরাও তখন নেমে পড়ল।

এখানে ওরা এক জায়গায় চা-বিস্কুট খেয়ে ল্যান্ডরোভারে এসে বসল। তারপর আবার দার্জিলিং। ম্যালে। ওদের হোটেলে।

হোটেলের সামনে দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। বাবলুদের দেখেই হাত নাড়ল ওরা। তার মানে আমরা আছি।

বাবলু কাছে গিয়ে বলল, "অকারণে আপনাদের কাজের ক্ষতি করে এখানে থাকার দরকার নেই। কেন না আমরা তো সব সময়েই বাইরে বাইরে ঘুরব। শুধু খাবার সময় আর রাত্রে শোবার সময় থাকব হোটেলে। আপনারা যেতে পারেন।"

কনস্টেবলরা বলল, "বেশ যাচ্ছি। তবে যদি কোনও অসুবিধা বোঝ তা হলে খবর দিয়ো আমাদের।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা।"

বলে দলবল সমেত হোটেলে ঢুকে ব্রেকফাস্ট সেরে আবার ঘুরতে চলল। এছাড়া কাজই বা কী? ঘরে বসে থাকবার জন্যে তো আসেনি। এখানে শুধু খাওয়া আর ঘোরা। ওরা প্রথমেই এল ম্যালে। ম্যালের দৃশ্য আজ সম্পূর্ণ অন্যরকম। ম্যাল আজ জনশূন্য। ঘন কালো মেঘ ম্যালের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে বয়ে

যাচ্ছে যেন ইঞ্জিনের কালো ধোয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে পাক খেয়ে ছুটছে। সেই অবজারভেটারি হিল মেঘে ঢাকা। ধাবমান মেঘের ঘনত্বের তারতম্যে কখনও সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কখনও আবছা দেখা যাচ্ছে। চারদিকের পাহাড়গুলোও উধাও। কাঞ্চনজঙ্ঘা দুরের কথা, সোনারুদের সেই ভুটিয়া বস্তিটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না।

এই রকম অবস্থায় বাবলুরা তো ম্যালে বসবার কথা কল্পনাও করতে পারল না। তাই ওরা ম্যাল থেকে নেমে পায়ে পায়ে ভুটিয়া বস্তির দিকেই চলল। সোনারুর মা-বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার একবার একান্ত দরকার। কেন না সোনারুর জন্য নিশ্চয়ই ওদের খুব মন কেমন করছে।

ওরা যা ভেবেছিল ঠিক তাই। সোনারুকে নিয়ে ওদের বাড়িতে যেতেই কমলা আদরে জড়িয়ে ধরল মেয়েকে। রূপলালও খুব খুশি। কমলা ওদের প্রত্যেককে মালপো তৈরি করে খাওয়াল।

সোনারুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা সকলে চলল দার্জিলিং শহরটাকে একটু ভাল করে ঘুরে দেখতে। প্রথমেই ওরা গেল চকবাজারে। তারপর হেঁটে এ পথ সে পথ করে স্টেশন। স্টেশন থেকে ঘুমের পথে আরও একটু এগিয়ে আবার পিছিয়ে এল ওরা। তারপর ফিরে এল হোটেলে।

মেঘটা এবার অল্প অল্প করে কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রোদও উঠছে। আবার মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। ঠিক যেন লুকোচুরি খেলা চলছে। যাক বাবা। তবু ভাল। বেড়াতে এসে মেঘলা আবহাওয়া একেবারেই অসহ্য। শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি বলে ওরা কেউ স্নান করল না। বারোটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আবার চলল বেড়াতে।

সোনারু সঙ্গে থাকায় খুবই সুবিধে হয়েছে ওদের লয়েড বোটানিকাল গার্ডেন দেখে অভিভূত হয়ে গেল ওরা। তারপর চিড়িয়াখানা হয়ে জওহর পর্বতে

তেনজিং নোরগের মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট দেখল। সোনারু বলল, "আরও একটু এগিয়ে চলো, তোমাদের আরও একটি ভাল জিনিস দেখাব।"

বাবলু বলল, "কী দেখাবে?"

"রোপওয়ে। এ পাশের পাহাড় থেকে ওপাশের রঙ্গীত উপত্যকা খুব ভাল লাগবে দেখতে।"

বাবলু বলল, "রোপওয়েতে চাপা যাবে না?"

"না। আগে থাকতে টিকিট কেটে রাখলে তবে চাপতে দেয়।"

"তা হলে আজ থাক। আজ আকাশের অবস্থা ভাল নয়। আমরা বরং অন্যদিন রোপওয়ে দেখতে যাব।"

আকাশের অবস্থা সত্যিই ভাল নয়। কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইছে আর চারদিক অন্ধকার করে ঘন কালো মেঘ সব কিছু ঢেকে দিচ্ছে।

সোনারু বলল, "সেই ভাল। আজ আবহাওয়াটা খুব খারাপ মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফিরে পড়া উচিত। মনে হচ্ছে শিলাবৃষ্টি হবে।"

বাবলুরা পা চালিয়ে পথ চলতে লাগল। উঃ। সে কী ভয়ংকর অবস্থা। এক এক সময় মেঘ এসে ওদের এমনভাবে ঢেকে দিচ্ছে যে ওরা কেউ কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না। এক হাত দূরের মানুষকেও দেখা যাচ্ছে না আর।

সোনারু বলল, "খুব সাবধান। পাহাড়ের গা ঘেঁষে বাদিক চেপে এগিয়ে চলো। ডানদিকে খাদ।"

বাবলু বলল, "কিন্তু পা যে চলছে না। যে অসম্ভব খাড়াই। মনে হচ্ছে বুকের রক্ত মুখে উঠে আসবে।"

এমন সময় হঠাৎ কঁকিয়ে চিৎকার করে উঠল পঞ্চু। পাহাড়ের উচ্চস্থান থেকে একটা গোলালো ভারী পাথর গড়িয়ে এসে ওর গায়ে পড়েছে। কী ভাগ্যিস সরাসরি পড়েনি। তা হলে থেতো হয়ে মরে যেত। তবু পাথর চাপা পড়ে ছটফট করতে লাগল বেচারি। ওরা পাথর সরিয়ে পঞ্চুকে মুক্ত করলেও যন্ত্রণায় কঁকিয়ে

উঠতে লাগল সে। ওর উঠে দাঁড়াবার শক্তিও বুঝি লোপ পেয়েছে। সামান্য জখম হয়েছে একটা পা। ওরা সবাই মিলে পঞ্চুকে ম্যাসেজ করে একটু আরাম দেবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সময় আবার একটি বড় পাথর ছিটকে এসে ওদের সামনে পড়ে গড়িয়ে গেল। তারপর আবার একটা। নেহাত ওরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছিল তাই রক্ষে। না হলে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা একটা কিছু ঘটে যেত।

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চুকে কাঁধে উঠিয়ে নিল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

ওরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে আরও একটু সরে এল।

পঞ্চু তখনও যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে। এক এক সময় এমন করছে যে ওকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। অনবরত আর্ত চিৎকার করছে, "কেউ-কেউ-কেউ-কেউ।"

সোনারু বলল, "শিগগির চলে এসো তোমরা। মনে হচ্ছে কেউ আমাদের জখম করতে চাইছে। কেন না আমার মনে হচ্ছে এ গড়িয়ে পড়া পাথর নয়।"

এমন সময় ভোম্বল হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "ওরে গেছিরে।"

একটা পাথরের টুকরো ছিটকে এসে লেগেছে ওর মাথার পিছন দিকে। যেখানে লেগেছে সেখানটা কেটে গল গল করে রক্ত ঝরছে। সেই অবস্থাতেই ওরা প্রাণপণে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যে পথে এমনিই উঠতে কষ্ট হয় সে পথে কি ছোটা যায়?

যাই হোক, ওরা বহু কষ্টে যখন আবার ম্যালে এসে পৌঁছল তখন সব ফাকা। কোথাও জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সমস্ত দোকানপাটও বন্ধ। সন্ধেও হয়ে এসেছে তখন। আর ঠিক সেই সময়েই শুরু হল প্রবল বর্ষণ। তার সঙ্গে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে বৃষ্টি থামলে পুলিশের একটি টহলদারি গাড়ি দেখতে পেয়ে ছুটে গেল বাবলু। তারপর ওদের বিপদের কথা খুলে বলতেই কাছেরই একটি হাসপাতালে ওদেরকে পৌঁছে দিল ওরা।

ভোম্বলের ক্ষতস্থানটা একটু গভীর। তাই প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ছোট একটা সেলাই দিয়ে ওখানটা ব্যান্ডেজ করে ভোম্বলকে হাসপাতালে ভর্তি করে নিল ওরা। ভোম্বল থাকতে চায়নি। কিন্তু ওরাই জোর করে রেখে দিল। বলল, দু-একটা দিন থাকো তারপর ছেড়ে দেব। না হলে আবার তো টো টো করে ঘুরবে।

শিলাবৃষ্টির আবহাওয়ার জন্যই কিনা কে জানে পঞ্চু তখন আগের চেয়ে একটু সুস্থ হয়েছে। তবে একটা পা তুলে রয়েছে সব সময়।

ভোম্বলকে হাসপাতালে ভর্তি করে বাবলুরা আবার হোটেলে ফিরে এল। সঙ্গে সোনারুও ছিল। বাইরে তখন কনকনে ঠান্ডা বললে ভুল হবে, রীতিমতো শৈত্যপ্রবাহ বইছে। রাত্রিও হয়েছে বেশ। কাজেই সোনারুকে ওদের বাড়িতে রেখে আসতে পারা গেল না।

বাবলু বলল, "তুমি আজও একটু কষ্ট করে আমাদের কাছে থেকে যাও সোনারু। কাল সকালে তোমাকে রেখে আসব। ভোম্বলের জন্য এখন তো আমাদের ঘোরা-বেরুনো এমনিতেই বন্ধ হয়ে উঠল। ভোম্বল ফিরলে আবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখব।"

সোনারু বলল, "ঠিক আছে। তবে তোমরা চাইলে যে ক'দিন তোমরা এখানে আছ সে কদিন তোমাদের কাছেও আমি থেকে যেতে পারি।"

বাবলু বলল, "যা তুমি ভাল বুঝবে।"

হোটেলে ফিরে ঘরে ঢুকে বাবলুরা প্রথমে কিছু খেতে দিল পঞ্চুকে। সকালে দার্জিলিং স্টেশন থেকে ওর জন্য কলা আর পাউরুটি কিনেছিল। তাই দিল। তারপর ওর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল বাবলু। জখম পা-টা আস্তে

করে চুঁচে দিতে লাগল। ওদের যার যাই হোক পঞ্চুর সেবার একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চু অসুস্থ হয়ে পড়লে ওদের সমূহ বিপদ। কেন না ওদের এখন প্রতি পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। প্রেমা তামাং যখন খেপেছে তখন ওদের সর্বনাশ না করে সে কিছুতেই ছাড়বে না। আজ খুব জোর প্রাণে বেঁচে গেছে ওরা।

এমন সময় গজাননবাবু এসে বললেন, "এই চিন্তা করছিলাম তোমাদের কথা। যা ঝড়-বৃষ্টি গেল। এই রকম আকাশের অবস্থা দেখে একটু সকাল করে ফিরবে তো। এত দেরি করে ফিরলে কেন?"

বাবলু বলল, "এক তো আমরা ঝড়-জলে আটকে পড়েছিলাম। তার ওপর আমাদের এক বন্ধু মাথায় চোট পেয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছে।"

"সে কী! হাসপাতালে শুয়ে আছে মানে তো বেশ গুরুতর ব্যাপার!"

"খুব একটা গুরুতর না হলেও আঘাতটা সামান্যও নয়।"

"কী রকম আঘাত পেল?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার মনে হয় দূর থেকে কেউ পাথর ছুড়ে আমাদের জখম করবার চেষ্টা করেছিল। পঞ্চুকেও মারবার চেষ্টা করেছিল। একটুর জন্য বেঁচে গেছে বেচারি। তবে পঞ্চুও আঘাত পেয়েছে।"

গজাননবাবু বললেন, "না জেনে সাপের গর্তে হাত দিয়ে বসে আছ তোমরা। খুব সাবধান।"

বাবলু বলল, "ভোম্বল না থাকলেও সোনারু কিন্তু আছে। ওর জন্যে তা হলে...।"

"ব্যস ব্যস। ও চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আমি এত বড় হোটেলটা চালাচ্ছি আমি জানি কাদের জন্যে কী ব্যবস্থা করতে হবে।" বলে চলে গেলেন।

পঞ্চু বাবলুর সেবা পেয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে চোখ বুজলে বাবলু উঠে বসল।

ভোম্বলের জন্য ওদের সকলেরই খুব মন খারাপ।

বিলু বলল, "দার্জিলিং ভ্রমণের সব আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। কী বল? কত আশা নিয়ে বেড়াতে এলাম কিন্তু এখন যা হল তাতে প্রেমা তামাং-এর একটা গতি না হওয়া পর্যন্ত এখানে চলাফেলা করা খুবই বিপজ্জনক।"

বাবলু বলল, "সত্যি। আর কপালগুণে আবহাওয়াটাও এখন এত খারাপ যে একটু ঘোরাঘুরি করে ওর পিছনে লেগে ওর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিয়ে যে যাব তাও সম্ভব নয়। এই রকম আবহাওয়ায় চলাফেরা করতে আমরা অভ্যস্ত নই তো।"

বিলু বলল, "ভোম্বল সুস্থ হয়ে এলেই আমরা বাড়ি ফিরে যাই চল।"

বাবলু বলল, "যেতেই হবে। মানুষের সঙ্গে লড়াই করা যায়। কিন্তু অশান্ত প্রকৃতির সঙ্গে কতক্ষণ যুঝব আমরা?"

রাত দশটা নাগাদ বাবলুরা খাবার আমন্ত্রণ পেল।

ওরা খেয়ে-দেয়ে আঁচাতে যাচ্ছে এমন সময় রূপলাল এসে হাজির, "সোনারু বিটিয়া?"

সোনারু মুখ ধুয়ে এগিয়ে এল বাবার কাছে।

রূপলাল বলল, "আজ ঘর যাওগী কি নেহি?"

সোনারু বলল, "আজ আমাদের খুব বিপদ গেছে, জান বাপি? ভোম্বলদা খুব চোট পেয়েছে। আমরাও ঝড় জলের মুখে পড়ে গিয়েছিলাম।

"কী হয়েছে ভোম্বলবাবুর?"

"কেউ মনে হয় পাথর ছুঁড়ে আমাদের মারতে চেয়েছিল। ভোম্বলদাদাকে হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েছে। এইসব করতে গিয়ে রাত হয়ে গেল বলে আজ আর ঘরে ফিরতে পারলাম না।"

"হাম তো আ গিয়া। ঘর যাওগী তো চলো মেরা সাথ।"

সোনারু বাবলুর দিকে তাকাল। বাবলু বলল, "তোমার বাবা যখন নিতে এসেছেন তখন তুমি আর থেকে না সোনারু। চলেই যাও। কাল সকালে আমরা বরং ভোম্বলের খবর নিয়ে তোমাদের বাড়ি বেড়াতে যাব।"

সোনারু ঘাড় নেড়ে 'আচ্ছা' বলে চলে গেল ওর বাবার সঙ্গে।

পরদিন যখন সকাল হল তখন বাবলুরা ভাবতেও পারেনি যে ওদের জন্য এমন দুঃসংবাদ অপেক্ষা করবে। পুলিশের একজন লোক এসে ওদের ঘর থেকে বার হতে একদম নিষেধ করে গেল। কাল মাঝরাত্তির থেকে ভোম্বলকে পাওয়া যাচ্ছে না। জানালার শার্সির কাচ ভেঙে কে বা কারা ওকে অপরহণ করে নিয়ে গেছে।

বাবলু চমকে বলল, "সে কী!"

পুলিশের লোক বলল, "হ্যাঁ, তোমাদের নিরাপত্তার জন্য এখন কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর চারদিকে জাল বিস্তার করে তন্ন তন্ন করে খোজা হচ্ছে ভোম্বলকে।"

শুনেই বাবলুর হাত পাথর থর করে কাঁপতে লাগল। পুলিশের লোক বলল, "দুঃসংবাদ আরও আছে। কাল রাত্রে ভুটিয়া বস্তির কাছে পথের মধ্যে রূপলাল খুন হয়েছে। সঙ্গে ওর মেয়ে সোনারু ছিল। তারও কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ওর বাবাকে খুন করে দুর্বত্তরা ওকে নিয়ে চলে গেছে।"

বাবলু আর দাঁড়াতে পারল না। শুনেই ধপ করে বসে পড়ল। পুলিশের লোক বলল, "এস পি'র নির্দেশ। তোমরা একদম বেরোবে না ঘর থেকে।"

বাবলু বলল, "সে আমরা বুঝে দেখব। তবে এখনই আমাদের বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা করে দিন।"

"বেশ তো, কী বলতে হবে লিখে দাও। আমরা করে দিচ্ছি।"

বাবলু একটা চিরকুটে ওর বাড়ির ঠিকানা লিখে সংক্ষেপে খবরটা জানিয়ে দিল বাড়িতে। পুলিশের লোক চলে যেতেই গজাননবাবু এসে বললেন, "কী থেকে

কী হয়ে গেল বলো তো? রূপলালটা খুন হয়ে গেল। আর মেয়েটাকেই বা অত রাত্তিরে তোমরা ছাড়লে কেন? বেশ তো ছিল তোমাদের কাছে।"

বাবলু বলল, "নিয়তি। না হলে অত রাতে রূপলালই বা আসতে যাবে কেন? শুধু তাই নয়, বেচারা ভোম্বল। একে মাথায় আঘাত পেয়েছে সে। তার ওপর...।"

গজাননবাবু বললেন, "ভোম্বলের আশা ছেড়ে দাও। আর সোনারুর কথাও ভুলে যাও তোমরা। এ সবই প্রেমার কাজ। ও যখন নিয়ে গেছে তখন ফিরিয়ে দেবে বলে নিয়ে যায়নি। তোমরা এক কাজ করো, এবার ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরে যাবার ব্যবস্থা করো।" এই বলে গজাননবাবু চলে গেলেন।

বিলু বলল, "তাই তো। কী করা যায় বল তো বাবলু?"

বাবলু বলল, "আমার তো মাথায় কিছু আসছে না। ভোম্বল যদি সুস্থ থাকত তা হলে ওর নিরুদ্দেশের জন্যে আমি শঙ্কিত হতাম না। বরং ভাবতাম শাপে বর হয়েছে। যে করেই হোক পালিয়ে এসে আমাদের খবর দেবে ও। তাতে করে ওদের ঘাঁটিটাও চেনবার সুবিধে হত আমাদের। আর সোনারু? সে অতি সহজ সরল সাধারণ একটি মেয়ে। সে কি ওদের গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসতে পারবে? সে তো কেঁদেই ভাসাবে সারাক্ষণ।"

বিলু বলল, "কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না সোনারুকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যটা কী? রূপলাল খুন হল কেন? রূপলালকে বাঁচিয়ে রেখে সোনারুকে নিয়ে গেলেও না হয় বুঝতাম টাকা-পয়সা কিছু আদায় করার মতলব আছে ওদের। কিন্তু তা তো করল না।"

বাবলু বলল, "তা নয়। প্রেমা তামাং বেশ ভাল রকমই জানে রূপলালকে মেরে ফেললেও বিশ পঁচিশ টাকার বেশি পাওয়া যাবে না ওর কাছ থেকে। রূপলালকে মারার পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে। আর ভোম্বলকে নিয়ে গেছে আমরা ওর পিছনে লেগেছি বলে। আমাদের পঞ্চু ওর সাগরেদ মংপুকে হত্যা

করেছে। সেই রাগে ও চাইছে আমাদের প্রত্যেককে এক এক করে শেষ করতে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু সভয়ে বলল, "বাবলুদা! প্রেমা তামাং কি সত্যি সত্যিই ভোম্বলদাকে মেরে ফেলবে?"

"কী করে জানব?"

বিলু বলল, "হয়তো এতক্ষণে শেষই করে দিয়েছে।"

বাবলু বলল, "ভয়টা তো সেখানেই। সত্যিকারের দস্যু হলে তাদের প্রাণে তবু একটা বিবেক বলে কিছু থাকত। তাদের রাগ থাকে এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের ওপর। সেই রাগের বদলা নিতে গিয়ে হয়তো অসহায় শিশুকেও বাদ দেয় না। কিন্তু প্রেমা তামাং যত ভয়ংকরই হোক ও একটা ছ্যাচড়া গুন্ডা। ওর শরীরে বোকা রাগ এবং বদ বুদ্ধি দুটোই বেশি। কাজেই প্রেমা তামাং পারে না এমন কোনও কাজই নেই। যেহেতু রূপলালের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে, সোনারু আমাদের সঙ্গে ঘোরে, অতএব ওদেরকেও শেষ করে দাও।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ঠিক তাই কি?"

"আপাতত এর চেয়ে অন্য কোনও সিদ্ধান্তে তো আসতে পারছি না আমি।"

একটু পরেই ব্রেকফাস্ট এল। খেতে খেতে বিলু বলল, "এই প্রথম আমাদের পরাজয়। হিমালয়ের কঠিন গিরিচূড়ায় এসে হেরে গেলাম আমরা। দিশাহারা হলাম।"

বাবলু হঠাৎ কী ভেবে যেন বলল, "না।"

"না মানে? তুই কি এখনও বলতে চাস আমরা হারিনি?"

"আমরা জিতেই গেছি। এবং প্রেমা তামাংই হেরে গেছে আমাদের কাছে।"

"সে কী!"

"ইয়েস। দুই আর দুইয়ে কত হয়?"

"চার।"

"আট।"

"কোনও ভুল নেই তো?"

"না। তা হলে এই সোজা অঙ্কের মতোই জেনে রাখ ভোম্বল আর সোনারু আমাদের হাতের মুঠোয়।"

"একটু পরেই দেখতে পাবি। আমি এখনই ওদের দু'জনকে আনতে যাচ্ছি। যদি ওরা বেঁচে থাকে তা হলে ঠিক ওদেরকে ফিরিয়ে আনব। যদি আমার কোনও বিপদ হয়, তোরা বাড়ি ফিরে যাস। এখন এক কাজ কর, তুই ঘরে থেকে বাচ্চু-বিচ্ছু আর পঞ্চুকে পাহারা দে।"

"কিন্তু ভোম্বল আর সোনারু কোথায় আছে তুই জানিস? তুই যে যেতে চাইছিস?"

"আছে আছে। ওরা আছে। ওদের খুঁজে বার করবই আমি।"

"তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবলু? কোথায় খুঁজবি ওদের? এই দুর্গম ভয়ংকর পার্বত্য এলাকায় ওদের খুঁজে পাওয়া কি যা তা ব্যাপার?"

বাবলু হেসে বলল, "ওদের কাছে আমাকে পৌছে দেবার জন্যে আমার বন্ধুরা চারদিকে অপেক্ষা করছে। কাজেই যাব মন করে বেরোলে ওদের কাছে যেতে একটুও অসুবিধে হবে না আমার।"

বিলু আশার আলো দেখে বলল, "হেঁয়ালি রাখ বাবলু। তুই কী করে কী করতে চলেছিস বল তো দেখি একবার। আমার সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"আরে বাবা এটা বুঝছিস না কেন, যারা ভোম্বলকে এবং সোনারুকে অত কাণ্ড করে বোকার মতো ধরে নিয়ে গেছে তারা তো আমাদেরকেও এক এক করে আলুভাতের মতো তুলে নিয়ে যাবার জন্যে ঘুর ঘুর করছে। কাজেই

একা একা এই পাহাড়ের একটু নির্জন স্থানে ঘুরে বেড়ালে ওরা এ টোপ গিলবেই এবং পরম সমাদরে আমাকে নিয়ে যাবে ওদের ডেরায়।"

"তারপর?"

"তারপর? ছুঁচ হয়ে ঢুকতে পারলে ফাল হয়ে বেরোতে কতক্ষণ?"

"দি আইডিয়া। ঠিক বলেছিস বাবলু। তবে একটা কথা। তুই নয়। আমি যাই। প্লিজ। প্রেমা তামাং-এর মুখে গিয়ে একটা ঘুষি ঝেড়ে আসি।"

"এত সোজা রে? ওসব কাচা কাজ করতে যাস না। আমি পিস্তল রেডি করে হিপ পকেটে ছুরিটা নিয়ে বেরোচ্ছি। চুপি চুপি সন্ধের ভেতর না ফিরলে পুলিশকে জানিয়ে দিবি। কেমন?"

বাবলু উঠতেই পঞ্চু খাটের তলা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে এল। বাবলু বলল, "না পঞ্চু। তুমিও নয়। তুমি অসুস্থ।"

পঞ্চু মুখে আওয়াজ করল, "গো-ও-ওউ। তার মানে সব ঠিক হয়ে গেছে আমার।"

বাবলু বলল, "না। আজ আমি একাই যাব।"

বিলু বলল, "তাই বা কেন হবে? যাব তো আমরা সবাই যাব।"

বাচ্চু-বিছু বলল, "সেই ভাল বাবলুদা।"

"কিন্তু তোরা কেন বুঝছিস না। পঞ্চু অসুস্থ।"

পঞ্চু তখন পিছনের দু পায়ে ভর দিয়ে সামনের পা দুটি গুটিয়ে একেবারে মানুষের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাবলু বলল, "চল তবে।"

ওরা সবাই বেরোল। হোটেলের সামনে, রাস্তায় চারদিকে পুলিশ। পুলিশের একজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে বলল, "এ কী ! কোথায় চললে তোমরা?"

বাবলু বলল, "কোথাও না। ঘরে বড্ড শীত করছে। তাই ম্যালের বেঞ্চিতে একটু রোদ্দুরে বসছি?"

"তা বসতে পারো। তবে এর বাইরে কোথাও যেয়ো না যেন।"

বাবলুরা ম্যালে এসে বসল। মুখে যতই ও দুই আর দুইয়ে চার হিসেব করুক মনের মধ্যে কিন্তু ওর দুশ্চিন্তার ঝড় বইছে। বেচারি ভোম্বল। কোথায় আছে, কীভাবে আছে, কেমন আছে কে জানে? আর সোনারু !

সে কি বেঁচে আছে? ওর সামনেই কি ওর বাবাকে খুন করা হয়েছিল? বেঁচে থাকলেও সোনারু যে পাগল হয়ে যাবে তা হলে। ও যে ওর বাবাকে বড় বেশি ভালবাসত।

বাবলুরা যখন ম্যালে এসে বসল তখন চারদিকে রোদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কী চমৎকার আবহাওয়া। কে বলবে যে কাল রাতে এই আকাশ জুড়ে, পাহাড় জুড়ে অমন তাণ্ডব লীলা চলেছে।

ওদের বসে থাকতে দেখে কয়েকজন সহিস ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে, "কী খোকাবাবু! ঘোড়ায় চড়বে? এই দিক দিয়ে গিয়ে ওই দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আনব। দুটাকা সওয়ারি।"

বাবলু বিলুকে বলল, "ম্যাল থেকে বেরোবার এই সুযোগ। না হলে পুলিশের লোকগুলো দেখতে পেলে যেতে বারণ করবে।"

বিলু বলল, "ঠিক। ঘোড়ার পিঠেই চড়া যাক।"

বাবলু রাজি হয়ে গেল! এ তো আনন্দ ভ্রমণ নয়। ম্যাল থেকে বেরোবার একটা কৌশল মাত্র। চারটে ঘোড়া আনিয়ে চারজনে চাপল। তাই দেখে একজন কনস্টেবল ছুটে এল, "এই কী হচ্ছে কী? তোমাদের বললে কেন শুনছ না? নামো। ম্যালের বাইরে যেয়ো না তোমরা।"

সহিসরা বলল, "ভয় নেই। আমরা তো আছি। এক পাক ঘুরিয়েই নামিয়ে দেব।"

"খুব সাবধানে নিয়ে যাবে।"

চারটে ঘোড়াকে নিয়ে চারজন সহিস এগিয়ে চলল। পঞ্চু চলল ওদের অনুসরণ করে। সহিসরা ঘোড়ার লাগাম ধরে সাথে সাথে চলল। ওরা যখন ছোটে ঘোড়াও তখন ছোটে। ওরা যখন ধীরে চলে ঘোড়াও তখন আস্তে যায়।

এইভাবে যেতে যেতে যখন ওরা ম্যালের ধার ঘেঁষে পিচ ঢালা পথ ধরে অবজারভেটারি হিলে পাক খেয়ে পিছন দিকে এসেছে তখন হঠাৎ এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। পাহাড়ের একটু উচ্চস্থান থেকে অথবা ঝুলে থাকা কোনও গাছের ডাল থেকে একজন শেরপা লাফিয়ে পড়ল বিচ্ছুর ঘোড়ার পিঠে। তারপর ওর সহিসকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বিচ্ছুকে নিয়েই ঘোড়ার লাগাম ধরে যে পথটা লেবং গ্রামের দিকে চলে গেছে সেইদিকে ছুটল।

বিচ্ছুকে নিয়ে যেতে দেখেই চিৎকার করে উঠল বাচ্চু, "বিচ্ছুরে—এ—এ—এ—।"

বাবলু তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পঞ্চু ছিল পিছনেই। সে করল কী হাউ হাউ করে এক পায়ে খুঁড়িয়েও ছুটে চলল বিচ্ছুর ঘোড়ার পিছু পিছু। কিন্তু পঞ্চুর দশগুণ জোরে বিচ্ছুর ঘোড়া ছুটল। পাকা ঘোড়-সওয়ারের হাতে পড়ে ঘোড়ার ছোটার গতি কী! বাবলু প্রথমে একবার হকচকিয়ে গেলেও তার কর্তব্য করতে সে ছাড়ল না। বিলুকে বলল, "তুই শিগগির বাচ্চুকে নিয়ে পালা। এখনই পুলিশে খবর দে। আমি বিচ্ছুর পিছু নিচ্ছি।" এই বলে সহিসের পরোয়া না করেই এতক্ষণের ঘোড়ায় চড়া যেটুকু রপ্ত হয়েছিল সেইটুকু বিদ্যাতেই ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিল।

ফল হল উলটো। অপটু হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে ছোটাতেই ঘোড়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। সে এমন ছোট যে বাবলুর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ল তখন। তবুও সে প্রাণপণে আঁকড়ে রইল ঘোড়াটাকে। ঘোড়ার লাফানিতে লাগাম হাতছাড়া হয়ে যেতে ঘোড়ার ঘাড়ের লোমগুলোকেই শক্ত হাতে

মুঠো করে ধরল বাবলু। ঘোড়া তখন পাগলের মতো লাফাতে লাফাতে লেবং-এর দিকে ছুটছে।

পথ ক্রমে জনশূন্য হয়ে এল। লেবং-এর ঢালু পথে ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই। ওই তো দূরে দেখা যাচ্ছে বিচ্ছুকে। শয়তান শেরপাটা ওকে নিয়ে পালাচ্ছে। হঠাৎ কী থেকে কী হয়ে গেল। ঢালু পথে ছোটার গতি সংযত করতে না পেরেই হোক অথবা খসে পড়া লাগাম পায়ে জড়িয়েই হোক বাবলুর ঘোড়াটা চিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ করে একটা বিকট আওয়াজ তুলে পাহাড়ের ঢালে গড়িয়ে পড়ল।

বাবলুর দেহটাও শূন্যে লাফিয়ে ঠিক যেন ঘুর্ণির মতো পাক খেয়ে ছিটকে পড়ল একটা ঝোপের ভেতর। বাবলু একবার উঠে বসবার চেষ্টা করল। পারল না। চোখ মেলে তাকাতে সব যেন কেমন ঘোলাটে মনে হল।

তারপর? তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

৫

বাবলুর যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে দেখল একটি অন্ধকার ঘরে তক্তপোশে পাতা বিছানায় সে শুয়ে আছে। ওর গায়ে একটা লেপ চাপা দেওয়া আছে বটে তবে তাই থেকে যে বোটকা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে তাতে ওর গা-মাথা ঘুলিয়ে উঠছে। বাবলু কোনওরকমে গা থেকে লেপ সরিয়ে উঠে বসল। ওর সর্বাঙ্গ টাটিয়ে ছুঁচ হয়ে আছে। বাবলু চিৎকার করে বলল, "আমি কোথায়?" বলেই হাফাতে লাগল সে।

এখানে সে কীভাবে এল, কতক্ষণ আছে, কিছুই মনে করতে পারল না। অনেক ভাবনা চিন্তার পর সকালের কথাটা তার মনে হল। সে কি জীবিত? না মৃত? সে যেখানে আছে সেখানটা কি সত্যিই অন্ধকার? না সে অন্ধ হয়ে গেছে? বাবলু আবার চেঁচিয়ে উঠল, "এই কে আছ? আমার খুব খিদে পেয়েছে।"

সত্যিই খিদে পেয়েছে বাবলুর। খিদেয় ওর পেট যেন জ্বলে যাচ্ছে। বাবলু আবার চেচাল, "আমাকে খেতে দাও। আমার ঘরে আলো দাও।"

বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে আলোর রেখাও ফুটে উঠল। খটখট শব্দ হল একটু। দরজা খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকল একজন লামা।

বাবলুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল লামাটা হলদে কাপড় পরা ন্যাড়-মাথা বৌদ্ধ লামা। লণ্ঠনটা ঘরের মেঝেয় বসিয়ে দিয়ে কোনও কথা না বলেই চলে গেল।

বাবলু দেখল ছোট্ট একটা খুপরি ঘরে সে বন্দি। ঘরে সে একা। এখন যে রাত কত তা সে বুঝতে পারল না। শুধু হাড় কাপা ঠান্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল সে। অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও যখন কেউ খাবার নিয়ে এল না তখন খুব ভয় হল ওর। ওরা কি ওকে না খাইয়ে মারবে? বাবলু আস্তে আস্তে

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে দেখল সেটা ওদিক থেকে শিকল দেওয়া—বন্ধ।

বাবলু ঘরের ভেতর থেকে দরজায় লাথি মারতে লাগল, "শিগগির দরজা খোলো। খোলো বলছি।" কিন্তু না। কেউ এল না। অতএব বাবলু নিস্তেজ হয়ে আবার এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। খিদের জ্বালায় সারা রাতে ঘুম এল না আর। জেগে জেগেই কেটে গেল সারাটি রাত।

পরদিন সকালে দু'জন লামা এসে ঘরে ঢুকল ওর। একজন বাবলুকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। তারপর বলল, "গায়ের ব্যথা মরেছে একটুও?"

বাবলু বলল, "না। এত তাড়াতাড়ি ব্যথা মরে?"

বাবলুর শরীরের অনেক জায়গা কেটে কুটে গেছে। সেখানে লাল ওষুধ মাখানো।

একজন দুটো ট্যাবলেট আর এক গেলাস জল দিয়ে বলল, "এ দুটো খেয়ে নাও। ব্যথা মরে যাবে।"

বাবলু বলল, "খালি পেটে কেউ ওষুধ খায় নাকি? কাল থেকে না খেয়ে আছি। আগে আমাকে খেতে দাও।"

লামারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। একজন বলল, "সে কী! কাল রাত্রে তোমাকে খেতে দেওয়া হয়নি?" -

"না।"

"ওঃ। খুব ভুল হয়ে গেছে। ঠিক আছে। এখনই খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে তোমার।" বলেই চলে গেল ঘর থেকে। তারপর এক প্লেট গরম হালুয়া এনে বলল, "খাও।"

বাবলু গোগ্রাসে সেই হালুয়া খেয়ে ট্যাবলেট দুটো গিলে নিয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "তোমাদের এখানে সারারাত এই ঘরে থেকে হাপিয়ে গেছি আমি। একটু বাইরে রোদ্দুরে বসতে দেবে?"

লামারা বলল, "হ্যাঁ বসো।"

বাবলু দিনের আলোয় ঘরটাকে এবার ভাল করে দেখল। আগাগোড়া ঘরটি কাঠের তৈরি। ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে আসতেই দেখল এক প্রান্তে মস্ত একটি বুদ্ধ মূর্তির সামনে দিবালোকেও সারি সারি বাতি জ্বলছে। দালান পার হতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের পর পাহাড়। ও একটা খোলামেলা উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়ল। এখানটা বেশ সমতল এবং মাঠ মতো। তবে এর তিন দিকেই গভীর খাদ। একদিকে একটি রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে! এইটাই বোধহয় যাতায়াতের পথ।

বাবলুর হঠাৎ মনে পড়তেই ওর গুপ্তস্থানে হাত দিয়ে দেখল পিস্তলটা নেই। না থাকবারই কথা। কিন্তু ও কিছুতেই ভেবে পেল না ও এখানে কী করে এল? দার্জিলিং থেকে এই জায়গাটা কতদূরে? এই বৌদ্ধ লামারা ওকে কেন এখানে নিয়ে এসে রেখেছে? ওরা তো ওকে হাসপাতালেও ভর্তি করে দিতে পারত। তবে কি এরা বৌদ্ধ নয়? এরা কি ভেকধারী? এরা কি প্রেমার লোকজন? নাকি প্রেমা এই লামাদের জোর জবরদস্তি করে বাবলুকে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য করেছে? বাবলুর মনে পড়ল ভোম্বলের কথা, সোনারুর কথা, বিচ্ছুর কথা। আর কি বাবলু পারবে ওদেরকে খুঁজে বার করতে? ওরা কোথায়? কোথায় ওদের লুকিয়ে রেখেছে দুর্বত্তরা? ভাবতে ভাবতে বাবলুর মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল।

লামাদুটাে ওর কাছে কাছেই আছে। অর্থাৎ বাবলু এখন নজরবন্দি। এবং শয়তানের ঘাঁটিতেই।

বাবলু মনে মনে একটা চাল খেলে লামাদের বলল, "কী সুন্দর জায়গাটা, না?"

"হ্যাঁ। তোমার এখানটা ভাল লাগছে?"

বাবলু হাতের আঙুল দিয়ে কপালটা সামান্য একটু টিপে ধরে খুব চিন্তা করার ভঙ্গিতে বলল, "আচ্ছা আমি এখানে কী করে এলাম বলতে পারো?"

"আমরা তোমাকে নিয়ে এসেছি। তুমি পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছিলে। তোমার জ্ঞান ছিল না। খুব ভাগ্য ভাল যে একটা ঝোপের ভেতর পড়েছিলে তুমি। না হলে তুমি মারা যেতে।"

"ও।" বাবলু বলল, "আমি কোথা থেকে এসেছি?"

"কেন, তোমার মনে পড়ছে না?"

"না।"

"তুমি দার্জিলিং থেকে এসেছ।"

"দার্জিলিং! সে কোথায়?"

"এই পাহাড়ের ওপারে।"

বাবলু আবার অনেকক্ষণ ধরে কী ভাবল। তারপর বলল, "আমি আগে কোথায় থাকতুম? আমার বাড়ি কোথায়?"

"সে কী! তোমার বাড়ি কোথায় সে তো তুমিই বলবে।"

লামা দুজন এবার নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করল। তারপর বলল, "তোমার নাম মনে আছে?"

"না।"

"নামও মনে নেই?"

"আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। কিছু মনে করতে গেলেই আমার মাথায় লাগছে।"

"এ তো ভাল কথা নয়। তুমি নাম বলতে পারছ না। বাড়ি কোথায় জানো না, আমরা তা হলে কী করে তোমাকে তোমার মা বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব?"

বাবলু ভয়ার্ত স্বরে বলল, "না না। আমি বাড়ি যাব না। আমি বাড়ি যেতে চাই না। আমি এখানে তোমাদের কাছেই থাকতে চাই।"

এমন সময় হঠাৎ সেই ঢালু পথটা বেয়ে একজন ভয়ংকর চেহারার অশ্বারোহী এসে হাজির হল সেখানে। বাবলু তাকিয়ে দেখল যে এল সে প্রেমা তামাং। বাবলু যেন কোনওদিন দেখেইনি তাকে এমন ভান করল।

ঘোড়ায় চেপেই বাবলুর সামনে ঘোড়া সমেত এগিয়ে এল প্রেমা তামাং, "কী খোকাবাবু, তবিয়ত ঠিক আছে তো? কুছ তকলিফ হুয়া তোনে হি?"

বাবলু ছুটে গিয়ে একজন লামাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ওকে চলে যেতে বলো। ও আমাকে মারতে আসছে।"

লামাটা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "না না। মারবে না। শুধু শুধু মারবে কেন তোমাকে?" তারপর প্রেমাকে বলল, "মালুম হোতা হ্যায় ইসিকো ব্রেন বিগড় গয়া।"

"এ ক্যায়সে হে সকতা?"

"ক্যায়সে আবার? তোমাদেরও যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। শুধু শুধু খুন খারাপি করে বাচ্ছা বাচ্ছা ছেলেমেয়েগুলোকে ধরে এনে এমন কাণ্ড করলে যে সববাইকে ঘটালে। চারদিক তোলপাড় করে ফেলছে পুলিশে।"

"আরে মারো গোলি। লেকিন হুয়া ক্যা? শিরমে জায়দা চোট লাগা?"

"চোট তো লাগা হুয়া। লেকিন লেড়কা কো কুছ ইয়াদ নেহি হোতা।"

"সচ?"

"সচ নয়তো কি ঝুট? পুরনো কথা কিছুই মনে পড়ছে না ওর। নাম বলতে পারছে না। ভুল ভাল বকছে।"

"হুম! ইয়ে বাত? লেকিন এ লেড়কা তো নম্বর ওয়ান কা পুরিয়া বহৎ হুশিয়ার"

প্রেমা তামাং এবার বাবলুর চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, "হমে ইয়াদ হ্যায় খোকাবাবু? ম্যায় হু প্রেমা তামাং।"

বাবলু বলল, "কে প্রেমা তামাং? আমি চিনি না।"

"আরে! এ ভি ভুল গয়া? তুমহারা সাথ হামারা মুলাকাত হুয়া টয় ট্রেন মে।"

বাবলু কান্নার সুরে বলল, "আমি কিছু মনে করতে পারছি না। আমাকে বকিয়ো না। আমার খিদে পেয়েছে। খেতে দাও।"

প্রেমা তামাং এবার ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল। ওর কাধে ঝোলানো বন্দুকটা ঝাঁকানি খেয়ে দুলে উঠল একবার।

লামারা বলল, "এখনও বলছি এদের ছেড়ে দাও প্রেমা। অযথা বিপদ বাড়িয়ে না।"

প্রেমা তামাং সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বাবলুকে বলল, "আমাকে তুমি পয়ছান্তে পারছ না খোকাবাবু, না? চলো এবার, যেখানে তোমার দোস্তরা আছে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। সেখানে গেলে সবাইকেই তুমি চিনতে পারবে।"

বাবলু বলল, "না। আমি কোথাও যাব না।" *

প্রেমা বাবলুর একটা হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে গেল ওকে। কাল সারারাত যে ঘরে ছিল বাবলু সেই ঘরের ভেতরে। তারপর মেঝেয় কবজা আঁটা একটা ভারী কাঠের ডালা তুলতেই ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া একটা সিঁড়ি দেখতে পেল ওরা।

প্রেমা বলল, "উতরো।"

বাবলু নামল। প্রেমাও নামল। লামারা বাইরেই ছিল। তারা আর ভেতরে এল না।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নামতেই একটা শিকল দেওয়া ঘর দেখতে পেল ওরা। সেই ঘরের শিকল খুলেই প্রেমা বলল, "উধার দেখো। কৌন হ্যায় উয়ো সব?"

বাবলু অবাক বিস্ময়ে বলল, "ওরা কারা!"

"তাজ্জব কী বাত। নিজের লোককেও চিনতে পারছ না?"

বাবলু বলল, "না।"

বাবলু মুখে না বললেও চিনতে সে ঠিকই পারছে সবাইকে। ভোম্বল, সোনারু, বিচ্ছু। এদের চিনবে না তো কাদের চিনবে বাবলু?

প্রেমা বলল, "ঠিক সে দেখো। ইয়াদ করো।"

মাথায় ব্যান্ডেজ বাধা ভোম্বল উল্লসিত হয়ে বলল, "বাবলু তুই! তোকেও ধরে এনেছে এরা?"

সোনারু আর বিচ্ছু এক সঙ্গে বলে উঠল, "বাবলুদা!"

বাবলু সভয়ে প্রেমাকে জড়িয়ে ধরল, "আমাকে ওপরে নিয়ে চলো। শিগগির ওপরে নিয়ে চলো আমাকে। ওরা আমাকে মারতে আসছে।"

"কাহেকো মারেগা তুমকো?"

বাবলু বলল, "না। ওরা আমাকে মারবে। তুমি শিগগির তোমার এটা দিয়ে মেরে ফেলো ওদের।" বলেই বাবলু শক্ত করে টিপে ধরল প্রেমার বন্দুকটাকে।

প্রেমা বলল, "আরে ছোড়ো ভাই। হুশ মে আও। ও তুমহারা দোস্ত হ্যায়।"

বাবলু বলল, "না। ওরা আমার কেউ নয়।"

বিচ্ছু হতচকিত হয়ে বলল, "বাবলুদা!"

"না না। আমি কারও দাদা নই।"

ভোম্বল বলল, "বাবলু! কী হল তোর? তুই আমাদের চিনতে পারছিস না? আমরা যে তোরই আশাতে বসেছিলাম। ভাবছিলাম তুই নিশ্চয়ই আসবি এবং আমাদের উদ্ধার করবি। কিন্তু এ কী হল তোর?"

বিচ্ছু তখন কান্না শুরু করে দিয়েছে। আর সোনারু? সে বাকহারা। স্তব্ধ। যেন নিস্প্রাণ একটি পুতুলমেয়ে।

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হচ্ছে ওরা নিশ্চয়ই তোকে কিছু খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে।"

বাবলু প্রেমা তামাং-এর বন্দুকটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই এক পা এক পা করে পিছোতে লাগল, "খবরদার। খবরদার কেউ আসবে না আমার সামনে। আমার সামনে যে আসবে আমি তাকেই গুলি করব।"

বাবলুর মূর্তি দেখে প্রেমা একটু হকচকিয়ে গেল, "আরে! এ কী করছ? ওটা খেলা করার জিনিস নয়। ওটা দিয়ে দাও খোকাবাবু। ওর ভেতরে গুলি পোরা আছে। অ্যায়সা মাত করো।"

বাবলু বলল, "জানি। আর জানি বলেই কৌশলে ওটা নিয়ে নিয়েছি তোমার কাছ থেকে। এই গুলি দিয়েই তোমার বুকের করজেটাকে আমি চুরমার করে দেব।"

"ও। তুমি তা হলে এতক্ষণ নকশা করছিলে আমার সঙ্গে?"

"তবে কি তুমি ভেবেছিলে আমি সত্যি সত্যিই সব কিছু ভুলে? এতক্ষণ আমি অভিনয় করেছিলাম শুধু।"

বিচ্ছু চেঁচিয়ে বলল, "আর একটুও দেরি কোরো না বাবলুদা, চালাও গুলি।"

বাবলু তখন পিছু হটে হটে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে প্রেমার সাধ্য নেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নেয়।

বাবলু একবার শুধু ভোম্বলকে ইশারা করল। চতুর ভোম্বলের সে ইঙ্গিত বুঝতে দেরি হল না। চকিতে সোনারু আর বিচ্ছুকে হেঁচকা টানে টেনে নিয়ে বাবলুর পিছনে চলে এল সে।

প্রেমা তামাং হা করে চেয়ে রইল বাবলুর দিকে।

বাবলু বলল, "একদম চেঁচামেচি কোরো না প্রেমা তামাং। লক্ষ্মী ছেলেটির মতো চুপচাপ বসে থাকে। তোমাকে আমি মারব না। যদি এখান থেকে পালাতে পারি তা হলে পুলিশ এসে তোমার যা করার করবে।" এই বলে ওরা ঘরের বাইরে এসে দরজায় শিকল তুলে দিল। তারপর ছুটে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে কাঠের ডালাটা চাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। এবার লামাদুটোর চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পারলেই বিপদ থেকে মুক্ত। এই ঘরে কাল বন্দি ছিল বাবলু। প্রথমেই ও নিজের পিস্তলটা উদ্ধার করার জন্য সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু না। কোথাও নেই সেটা। দালানের শেষ প্রান্তে প্রভু বুদ্ধের মূর্তি। একটা দেওয়ালের হুকে টুপির মতো দুটো ন্যাড়া মাথার কাপ আটকানো। বাবলু হঠাৎ দেখল সেই লামাদুটো পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওদের মাথা চুলে ভর্তি। পরনে ফুল প্যান্ট। লামারা দালানে এসে প্যান্টের পায়া গুটিয়ে হলুদ রঙের কাপড়টা আলনা থেকে নিয়ে বেশ কায়দা করে পরল। তারপর সেই ক্যাপদুটো মাথায় এঁটে আবার বৌদ্ধ শ্রমণের ভেক ধরে বুদ্ধ মূর্তির দিকে এগিয়ে গিয়ে টুকটাক কিছু কাজ করতে লাগল।

বাবলু দরজার আড়াল থেকে উঁকি মেরে ওদের লক্ষ করতে করতে যখন দেখল ওরা এদিকে পিছন হয়েই সব কিছু করছে তখন চুপি চুপি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর ইঙ্গিতে সোনারু, ভোম্বল ও বিচ্ছুকেও আসতে বলল।

ওরা নিঃশব্দে বাইরে এসে দেখল প্রেমার ঘোড়াটা এক জায়গায় বাধা আছে। বাবলু করল কী সর্বাগ্রে ওর বাঁধনটা খুলে দিল। ঘোড়াটা তখন লেজ নেড়ে নেড়ে মনের আনন্দে মাথাটা দুলিয়ে হঠাৎ খুব জোড়ে ছোটা আরম্ভ করল।

এখানে এই প্রশস্ত স্থানটুকুর তিন দিকে খাদ। একদিকে পথ। বাবলুরাও ঘোড়ার পিছু পিছু সেই পথ ধরল। অশ্ব-খুরের শব্দ শুনে লামাদুটো ছুটে এল তখন। তারপর ওদের পালাতে দেখেই চিৎকার করে উঠল, "আরে! ইয়ে সব ভাগা ক্যায়সে? ঘোড়ে কে রশি খুল দিয়া কেন।" বলে যেই না ওদের দিকে ছুটে আসতে যাবে বাবলু অমনি বন্দুক উঁচিয়ে তাগ করল ওদের দিকে। তারপর ট্রিগার টিপতেই দড়াম'। জানলার কাচের শার্শি ভেদ করে ছুটে গেল গুলি। ওরা ওই অবস্থাতেই মাটিতে শুয়ে পড়ে কোনওরকমে গুলির থেকে বাঁচাল নিজেদের। তারপর প্রাণপণে ছুটল ঘরের দিকে।

বাবলু বলল, "ভোম্বল, আমি বন্দুক নিয়ে ভয় দেখাই আর ওরা ঘরে ঢুকলেই তুই শিকলটা তুলে দে।"

পরিকল্পনা মতো তাই হল। লামাদুটো ঘরে ঢুকে দুম করে দরজা বন্ধ করে দিতেই ভোম্বল ছুটে গিয়ে ঘরের শিকল তুলে দিল।

বাবলু বলল, "তাড়াতাড়ি আয়। এই সুযোগে যতটা পালাতে পারি।"

ভোম্বল বলল, "আবার ভয় কী! সবকটাই তো বন্দি।"

বাবলু বলল, "ও কতক্ষণ? ওরা এখনই গিয়ে প্রেমাকে মুক্ত করবে। তারপর জানলা দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসবে।"

বিচ্ছু বলল, "আসলে ঘোড়াটাই গোলমাল করে দিল। তুমি সাত তাড়াতাড়ি ঘোড়াটাকে খুলে দিতে গেলে কেন বাবলুদা?"

"ওইটাই ভুল হল রে। আসলে আমি ভেবেছিলাম আমরা পালানোর পর যখন ওরা টের পাবে তখন আমাদের তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করার জন্য ঘোড়াটার সাহায্য যেন না পায়। কিন্তু ঘোড়াটা যে অমন কাণ্ড করবে তা কে জানত?" বলতে বলতেই ওরা ছোটা শুরু করল।

পাহাড় থেকে নামার পথ ঢালু ঢালু পথে কখনও ছুটতে নেই। মাধ্যাকর্ষণের টানে যে কোনও মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাবলু তাই সাবধান করে দিল সকলকে।

বেশ কিছুটা নেমে একটা বাক ঘোরার পরই দূরের পাহাড়ের গায়ে সাজানো ঘরবাড়ি চোখে পড়ল সকলের।

সোনারু বলল, "আমরা দার্জিলিং থেকে খুব বেশি দূরে নেই।"

বাবলু বলল, "কী করে জানলে?"

"ওই তো দার্জিলিং দেখা যাচ্ছে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ও তো অনেক দূরের পাহাড়। ওখানে যাব কী করে?"

"রোপওয়ে আছে।"

"রোপওয়ে তো বন্ধ।"

"রোপওয়ে বন্ধ থাকলে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে আমাদের। একটু কষ্ট হবে অবশ্য। তবে আমি নিয়ে যাতে পারব।"

এমন সময় হঠাৎ পিছন দিকে কাদের যেন ছুটে আসার পদশব্দ শোনা গেল। বাবলুরা কথা বন্ধ করে চকিতে লুকিয়ে পড়ল একটা বড় পাথরের আড়ালে। একটু পরই ওরা দেখতে পেল সেই লামা দু'জন হন্তদন্ত হয়ে ঢালু পথ বেয়ে নেমে আসছে। ওরা নিঃসন্দেহে ওদেরকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু মুশকিল হল ওরা পথ পার হয়ে নেমে গেলেও বাবলুরা পাথরের আড়াল থেকে সরে এল না। কেন না এই একটি মাত্র পথ। ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত বা অনেক দূর না যাওয়া পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করলেই বিপদ। তাই ওরা চুপচাপ লুকিয়ে বসে রইল।

হঠাৎ ভোম্বলের চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল সকলে। পিছন ফিরে দেখল ভোম্বল নেই। ভোম্বলের গলা কয়েক হাত দূর থেকে শোনা গেল, "বাবলু!" ওরা

দেখল প্রেমা তামাং কখন যেন চুপি চুপি এসে ভোম্বলকে পিছন থেকে টেনে নিয়ে শক্ত করে টিপে ধরে বেশ কয়েক হাত দুরে দাঁড়িয়ে আছে। ভোম্বল দাপাদাপি করে চেষ্টা করছে ওর কবল থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। প্রেমা তামাং বলল, "আভি বন্দুক রাখ দো খোকাবাবু!"

বাবলু বলল, "আগে তোমার মাথার খুলিটা আমি ওড়াব তারপর রাখব।"

প্রেমা তামাং বলল, "উসমে ফায়দা ক্যা? আমার দিকে গুলি ছুড়লে তোমার দোস্তই মরবে আগে।" বলেই ভোম্বলকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "নাও ভাই, চালাও গোলি।"

বাবলুর হাত আর উঠল না। যেমনকার বন্দুক তেমনই ধরা রইল। ভোম্বল প্রেমার কাছ থেকে চেঁচিয়ে বলল, "বাবলু তোর পিছন দিকে চেয়ে দেখ।" বাবলু ঘুরে তাকিয়েই দেখল সেই লামাদুটো কখন যেন নিঃশব্দে উঠে এসেছে। সম্ভবত প্রেমার গলার স্বর শুনেই ফিরে এসেছে ওরা। ওরাই প্রেমাকে বৌদ্ধ মঠের বদ্ধ ঘর থেকে মুক্ত করেছে এবং তারপর জানলা দরজা ভেঙে অথবা অন্য কোনও গোপন দরজা দিয়ে বাইরে এসেছে। এখন কী আর এদের খপ্পর থেকে নিজেদের রক্ষা করা যাবে?

লামারা বলল, "ফিক দো বন্দুক।"

বাবলু একজনের দিকে বন্দুক তাগ করে বলল, "দিচ্ছি। একটু সবুর করো।" বলেই ট্রিগার টিপল বন্দুকের। অমনি পাহাড় ও বনভূমি কাঁপিয়ে প্রচণ্ড একটা শব্দ হল গুড়ুম।

আর সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে যেন শুরু হল দারুণ একটা ঘর ঘর শব্দ। অর্থাৎ রোপওয়ের। রোপওয়ে কি চালু হয়েছে? হোক। বেল পাকলে কাকের কী? বাবলুর গুলি খেয়ে একজন লামা মুখ থুবড়ে পড়তেই অপরজন পিছিয়ে গেল।

প্রেমা তামাং তখনও শক্ত করে ধরে আছে ভোম্বলকে, "আভি বন্দুক ফিক দো খোকাবাবু। ম্যায় কুছ নেহি কিয়েগা। সবকে ছোড় দুঙ্গা ম্যায়।"

বাবলু বলল, "আগে ভোম্বলকে ছাড়ো।"

"নেহি। পহলে তুম বন্দুক ছোড়ো।"

"না প্রেমা তমাং তুমি একজন ক্রিমিনাল। তুমি খুনি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। আগে তুমি ভোম্বলকে ছাড়ো। তারপর হয় তুমি বুলেটের মুখে বুক পেতে দাও নয়তো ধরা দাও পুলিশের কাছে।"

প্রেমা এবার রক্তচক্ষুতে বলল, "উয়ো বাত ছোড়ো। জলদি বন্দুক ফিক দো। নেহি তো তুমহারা দোস্ত কো ফিক দেঙ্গে খাদ মে। মেরা নাম প্রেমা তামাং।"

ভোম্বল চেঁচিয়ে বলল, "বাবলু, খবরদার বন্দুক দিস না। আমি শয়তানটাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে আছি যে আমাকে ফেলতে গেলে ও নিজেও পড়বে।"

ভোম্বলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমা তামাং এক ঝটকায় ভোম্বলকে এক পাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে পড়ল বাবলুর সামনে। তারপর বাবলুকে কোনও কিছু বুঝে ওঠবার সময় না দিয়েই বন্দুকটা কেড়ে নিতে গিয়ে চিৎকার করে উঠল। কেন না আচমকা ট্রিগারে চাপ পড়ে যাওয়ায় বন্দুকের গুলি ছিটকে গিয়ে প্রেমার ডানদিকের কাঁধে লেগেছে।

প্রেমা তামাং যন্ত্রণায় আ—আ—আঃ করে উঠল। যে লামাটা এতক্ষণ পিছিয়ে ছিল সে এবার সাহস করে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর। ওর হাত থেকে বন্দুক সে কাড়বেই।

আর একটা গুলি ছিটকে গেল। এটা অবশ্য কারও গায়ে লাগল না। একদিকে ভোম্বল এবং অপরদিকে সোনারু ও বিচ্ছু নীরবে দেখছিল সব কিছু। প্রেমা তামাং বা হাতের চেটো দিয়ে ডান কাঁধের ক্ষতস্থান টিপে ধরে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যাচ্ছিল। ভোম্বল একটা বড়সড় পাথর কুড়িয়ে আক্রমণকারী লামাটার

মাথায় সজোরে মারল এক ঘা। এক ঘা-ই যথেষ্ট। লামাটা বাবলুকে ছেড়ে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

অদূরে দণ্ডায়মান প্রেমাকে লক্ষ্য করে এরা সবাই তখন এক জোটে ছোট বড় নুড়ি পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল।

প্রেমার ডান হাতটা সম্পূর্ণ অবশ। বাঁ হাতের সাহায্যে কোনওরকমে সেই নিক্ষিপ্ত নুড়ি পাথরগুলোকে আটকাবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "মাত মারো। এ খোকাবাবু, মাত মারো হামকো। মর যায়েঙ্গে।"

ভোম্বল বলল, "মৃতুকে তোমার বড় ভয় না? যখন পাথর ছুড়ে আমার কপাল ফাটিয়েছিলে তখন বোধ হয় ভাবতে পারনি এই পাথর আমরাও ছুড়ব তোমার কপালে? যখন পাথর চাপা দিয়ে আমাদের পঞ্চুকে মারতে গিয়েছিলে তখন নিশ্চয়ই মনে হয়নি আমরা কখনও এর প্রতিশোধ নেব বলে?"

বন্দুকের গুলি লাগা প্রেমার কাঁধ থেকে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে তখন। তার ওপর মুখে মাথায় নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে কেটে যাওয়া জায়গাগুলো থেকেও চুয়ে চুয়ে রক্ত পড়ছে। প্রেমা বলল, "শোনো খোকাবাবু। আমার বাত তো শোনো। এ কাম হামারা নেহি। আমি কোনও বাচ্চা ছেলেকে মারি না। তুমহারা কুত্তা মংপুকা জান লে লিয়া। ইসি লিয়ে মংপুকা ভাই রংপুনে অ্যায়সা কাম কিয়া। এ কাম করনেকে লিয়ে বহুত মানা কিয়া থা হাম। রূপলালের বিটিকে জিজ্ঞেস করো। ওর বাবাকে আমি মারিনি। তোমার দোস্তকে জিজ্ঞেস করো, ওইদিন রাত্রে আমি ওকে নিয়ে যাইনি। বুটমুট আমি মানুষ মারি না।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু আমি জানতে চাই রংপু কোথায়? তার সঙ্গে আমার একটু বোঝাপড়া আছে।" এ

মন সময় ভয়ংকর চেহারার একজন শেরপা বন্দুক হাতে ছুটে এল সেখানে, "রংপু ম্যায় হু। মেরা ভাই ক খুন কা বদলা হাম খুন সে লে লেঙ্গে।

তুম সবকে মরণে পড়েগা খোকাবাবু! তোমাদের সবাইকে একটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে পুড়িয়ে মারব আমি। তবেই আমার রাগ যাবে।"

বাবলু বলল, "তোমার ভাই খুনি। একটা বাচ্ছা মেয়েকে সে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। তাই আমরা তাকে বাধা দিয়েছিলাম। তখন সে আমাকে মারতে আসছিল বলে আমাদের কুকুর তার টুটি ছিড়ে নিয়েছিল। এতে আমাদের দোষ কোথায়?"

রংপু বলল, "এখন আমিও যদি তোমাদের সেই কুকুরটাকে কাছে পাই তা হলে তার টুটিটাকে আমি ছিড়ে ফেলব।" বলে হাত মুঠো করে কবজি ঘুরিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গি করল রংপু। তারপর বলল, "কোথায় তোদের কুকুর?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চুর গলা শোনা গেল, "ভৌ। ভোঁ ভৌ।"

রংপুর পিলে চমকে উঠল, "অ্যা! আগিয়া? কাহা সে আয়া?"

বাবলুরাও অবাক। সত্যিই তো! কোথা থেকে এল পঞ্চু?

বাবলু বলল, "তুমি ওকে যমের বাড়ি পাঠাতে চেয়েছিলে, আমার মনে হচ্ছে ও সেখান থেকেই ফিরে এসেছে তোমাকে নিয়ে যাবে বলে। এবার তুমি যাবার জন্যে তৈরি হও।"

প্রেমা চিৎকার করে বলল, "হুশিয়ার রংপু ও কুত্তা বহুত খতরনক। ভেরি ডেঞ্জারাস।"

রংপু সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল উঁচিয়ে বলল, "ম্যায় উসসে জায়দা ডেঞ্জারাস হু। আভি মুকাবিলা হো যায়ে গা।"

পঞ্চু তখন ছুটে এসে রংপুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। পঞ্চুকে দেখে বাবলুর দেহে যেন অসুরের শক্তি ফিরে এল। সাহসে ভরে উঠল বুক।

রংপু তো এই সুযোগই খুঁজছিল। পঞ্চুকে দেখে এবং সামনা-সামনি পেয়ে বন্দুক তাগ করল সে। বাবলু চোখের পলকে রংপুর ট্রিগার টেপবার আগেই নিজের বন্দুকটা দিয়ে সজোরে ওর হাতের ওপর মারল এক ঘা। রংপুর হাত

থেকে বন্দুক ছিটকে পড়ল। ওরই মধ্যে ট্রিগারে চাপ পড়ে গেছে। 'গুড়ুম শব্দ করে লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা পাহাড়ের একটি পাথরে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে এসে লাগল অচৈতন্য দ্বিতীয় লামাটার গায়ে।

নিরস্ত্র রংপুর ওপর সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু। বেগতিক দেখে প্রেমা তখন মঠের দিকে ছুটেছে। পঞ্চুর আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে রংপুও ছুটল সেদিকে।

বাবলুরাও ধাওয়া করতে যাবে এমন সময় দূর থেকে বিলুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাবলু! আমি এসে গেছি।"

বাবলু হেঁকে বলল, "আমরা সবাই ঠিক আছি। তুই সাবধানে আয়। বাচ্চু কোথায়?"

বাচ্চুও আছে। ভোম্বল তখন রংপুর বন্দুকটা কুড়িয়ে আনল। বাবলুর হাতে প্রেমার বন্দুক তো আছেই। বিলু আর বাচ্চু ওদের কাছে এলে ওরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে মঠের দিকে ছুটল।

প্রেমা ও রংপু তখন অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। পঞ্চু সমানে তাড়া করে চলেছে ওদের। বাবলুরাও মারমুখি হয়ে ধাওয়া করল। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সোনারু সবাই। ছুটতে ছুটতে বাবলু বলল, "খুব তালে পঞ্চুকে পাওয়া গেছে। কিন্তু আমরা যে এখানে আছি তোরা কী করে জানতে পারলি?"

বিলু বলল, "বাচ্চু আর আমি কাল থেকে ঠায় গজাননবাবুর টেলিস্কোপটা নিয়ে চারদিকে নজর রাখছিলুম। আজ সকালে হঠাৎ দেখি এই পাহাড়ে একটা মঠের সামনে দুজন লামার কাছে তুই দাঁড়িয়ে। তারপরই দেখি বীরপুরুষের মতো ঘোড়ায় চেপে প্রেমা তামাং এসে জুটল। তোকে কী যেন বলল ও বলে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। আর কিছু দেখিনি। তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে টেবিলের ওপর রেখে বাচ্চু আর পঞ্চুকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। প্রথমেই এলাম রোপওয়ে স্টেশনে।"

"কিন্তু রোপওয়ে তো বন্ধ ছিল।"

"আমরাই চালু করলাম।"

"তোর বাহাদুর আছে বলতে হবে।"

"এমনিতে হয়নি। অনেক ধরাকওয়া করতে হয়েছে। তা ছাড়া এখানে আমাদের নিয়ে যে সব ঘটনাগুলো ঘটেছে তা তো কারও অজানা নয়। তাই আমাদের বিপদের কথা বলতেই রাজি হয়ে গেল ওরা। আমি ওদেরকে বলে এসেছি পুলিশে খবর দিয়ে দেবার জন্য।"

ওরা ছুটতে ছুটতে হাফাতে হাফাতে ওপরে উঠে এল। এই সব খাড়াই জায়গায় এমনিই ওঠা যায় না। তায় ছোটা। মনে হচ্ছে যেন বুকের রক্ত মুখ দিয়ে উঠে আসবে। ওপরে উঠে সবাই হাফাতে লাগল।

বৌদ্ধ মঠের সামনে সেই প্রশস্ত সমতলে শুরু হল পঞ্চুর খেলা। কাউকে কামড়াল না কিছু করল না শুধু ঘেউ ঘেউ শব্দে তাড়া করে রংপু ও প্রেমাকে এদিক থেকে ওদিক এবং সেদিক থেকে এদিকে ছুটিয়ে মারতে লাগল।

পঞ্চুর ভয়ংকর আক্রমণে প্রেমা ও রংপু দিশাহারা। ভোম্বল বলল, "আর দেরি নয় বাবলু, পুলিশ আসার আগেই শেষ করে দে দুটোকে। না হলে পুলিশ এদের ধরলেও কোর্টের বিচারে এদের জেল হবে। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে এলে আবার যা কে তাই হয়ে যাবে এরা।"

সোনারু হঠাৎ চোখ-মুখ লাল করে হিংস্রমূর্তিতে বলল, "না বাবলুদা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। ও কাজ কোরো না তুমি। ওই শয়তানদের জন্যে আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি। আমার প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ। ওদের মরণ আমার হাতেই ঘটতে দাও।"

বাবলু বলল, "না সোনারু। একমাত্র আত্মরক্ষার সময় ছাড়া কোনও অবস্থাতেই আইনটা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়।"

বিলু বলল, "আর কেন? পুলিশ তো এল বলে।"

বাবলু বলল, "তা ছাড়া শাস্তি যা হবার যথেষ্ট হয়েছে ওদের।"

কিন্তু সোনারুর তখন অন্য রূপ। সে উন্মাদিনীর মতো হাতের সামনে ছোটবড় পাথরের টুকরো যা পেল তাই নিয়ে ছুড়ে মারতে লাগল রংপুকে।

পঞ্চুর ভয়ে রংপু কিছুই করতে পারল না। দাঁড়িয়ে মার খেতে লাগল শুধু সোনারু একটার পর একটা পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল ওর দিকে। প্রেমার সারা দেহ রক্তে ভাসছে। রংপু রক্তস্নাত। সোনারুর একটা নিক্ষিপ্ত পাথর হঠাৎ রংপুর নাকে এসে লাগল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রংপু। তার আর উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা রইল না। সেই সুযোগে সোনারু আরও একটা বড়সড় ভারী পাথর এনে ওর মাথায় কয়েক ঘা দিয়ে একেবারে গুড়িয়ে দিল মাথাটাকে।

রংপুর প্রাণহীন দেহটা পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়ল। সোনারু এবার দুহাতে ওর মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল, "বাবুজি.আমার বাবুজি.।"

বাচ্চু-বিচ্ছু ওর কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার জন্য দুহাতে জড়িয়ে ধরল সোনারুকে। প্রশস্ত সমতলের ওপর তখন দলে দলে পুলিশ এসে জড়ো হচ্ছে। পঞ্চু প্রেমা তামাংকে ছেড়ে রংপুর কাছে এল। তারপর ওর মুখে মুখ দিয়ে একটু শুকে দেখে ওর বুকের ওপর উঠে রাগে গরগর করতে লাগল।

পুলিশ এসে রক্তস্নাত প্রেমার দুহাতে হাতকড়া পরাল। সেই আনন্দেই বুঝি আকাশের দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চু, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"